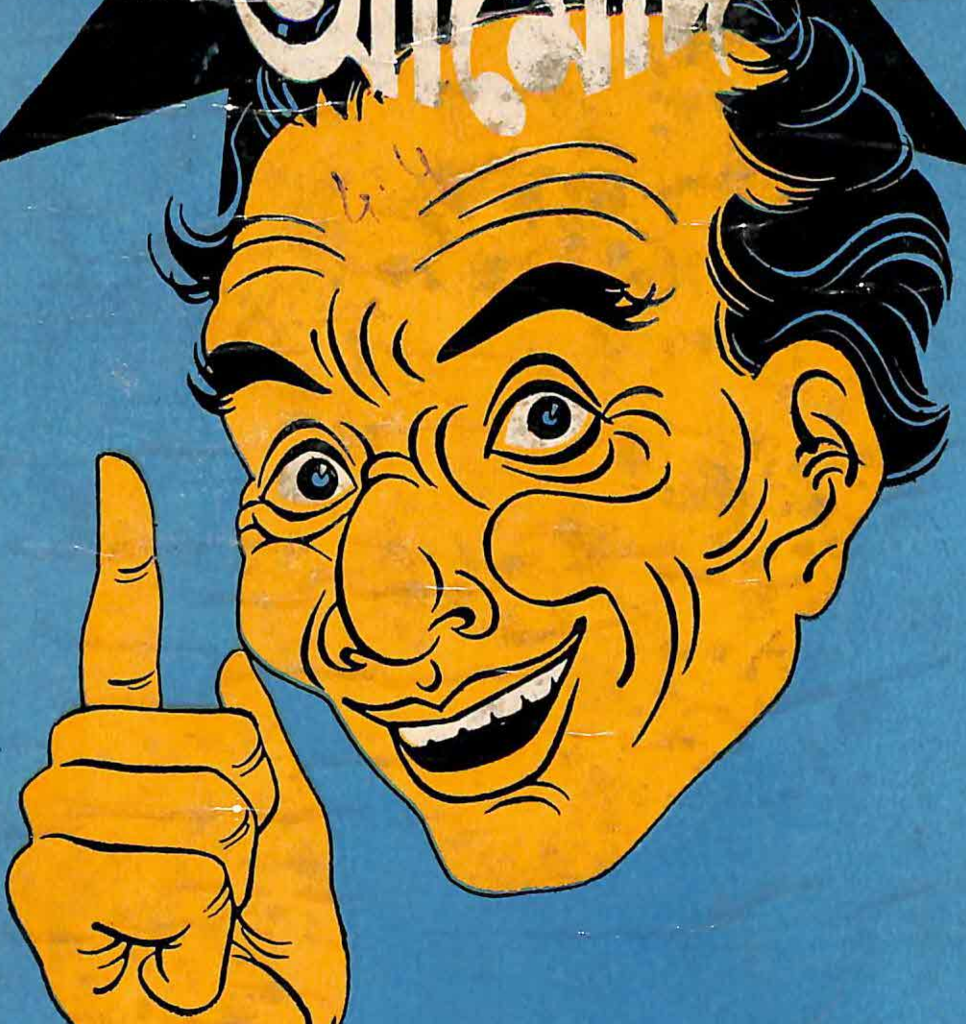
আশাপূর্ণা দেবী

নিখরচায় আমোদ



নিখরচায় আমোদ

আশাপূর্ণা দেবী

বিমলারঞ্জন প্রকাশন
৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৯ সাল
৯ই মে, ১৯৮২

প্রচ্ছদ ঃ
গণেশ বোস

প্রকাশক ঃ
শ্রীবিমলারঞ্জন চন্দ্র
বিমলারঞ্জন প্রকাশন
৮।১সি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রক ঃ
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২৩বি কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মূল্য ঃ আট টাকা মাত্র

একটি ক্ষুদে আঙুলের জন্যে

কদিন ধরে বাড়িতে যেন একটা সাজসাজরব পড়ে গেছে। ঝুল ঝাড়া হচ্ছে, মেজে ঘসা হচ্ছে, আর্শি আলমারি জানলার কাঁচ চেয়ার টেবিল সব মুছে মুছে ঝকঝকে করা হচ্ছে, আর পুব বারান্দার দিকে যে ঘরটা, সেটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

কারণ?

কারণটা শুনছি সাবুমামা আসবেন। সাবুমামা আমার ঠিক কি রকম মামা তা আমার জানা নেই, তবে খোদ দিদিমার ছেলে নয় তা জানি। দিদিমার তো কোন ছেলেই নেই। মা আর বড়োমাসি, এই তো দুই মেয়ে দিদিমার। যাই হোক মার ভাই তো নিশ্চয়, নইলে আর আমাদের মামা হলেন কি করে?

সাবুমামার আসল নাম সাবিত্রীপ্রসন্ন, ডাকনামে ওই প্রকাণ্ড ব্যাপারটা হয়ে গেছে সাবু। যেমন আমার নাম সিদ্ধার্থসুন্দর, কিন্তু ডাকনামে পৌঁছেছি সিধুতে। এতোটুকু একটু নাম ধরেই যদি ডাকবে, তার বেশী যখন খাটতেই চাইবে না, ওই লম্বা চওড়া একটা নাম যে কেন রাখা!

সে যাক, এখন প্রধান প্রসঙ্গ সাবুমামা।

সাবুমামা আসছেন।

আসছেন বাইশ বছর পরে।

হ্যাঁ, কথাটা শুনে চমকাবার মতোই, কিন্তু কতো চমকপ্রদ ঘটনাই তো সংসারে অহরহ ঘটছে। বাইশ বছর আগে সেই যে হঠাৎ একদিন অন্তর্ধান হয়ে গিয়েছিলেন সাবুমামা, সেটাই কি কম চমকপ্রদ হয়েছিল? তবে ব্যাপারটা দুঃখের ছিল এই যা।

খুবই দুঃখের।

আমি অবশ্য দেখিনি ঘটনাটা, মানে দেখবার উপায়ও ছিল না, আমি তো তখন জন্মাইনি। দিদি নাকি সবে হামা দিচ্ছে তখন।

দিদির সেদিন অন্নপ্রাশন, বাড়িতে অনেক লোকের নেমন্তন্ন হয়েছে, দিদিমার বাড়ি থেকেও যারা যারা আসবার এসেছে, সেই সঙ্গে সাবুমামাও এসেছেন। সাবুমামার তো নিজের মা বাপ ভাইবোন কেউ ছিলো না, দিদিমার কাছেই থাকতেন, মায়ের নিজের ভাইয়ের মতোই। মা বলেছেন, খুকুকে সাবুই মুখে ভাত দেবে। সাবুমামা তখন বছর ষোলোর ছেলে, সবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছেন, ছুটি চলছে, কাজেই এসব ব্যাপারে খুবই হৈচৈ আমোদ আহ্লাদ করার কথা। করছেনও।

মুখে ভাত দেবার সময় মামাকেও নতুন ধুতি চাদর পরতে হয়, তাই মা নাকি জরিপাড় ধুতি চাদর আনিয়ে রেখেছেন, সাবুমামা খুশী হয়েও বলেছেন, এ মা জরিপাড় ধুতি আবার মনুষে পরে নাকি ?'

বাবা বলেছেন, 'তবে কি গরু টরুরা পরে ?'

তাই নিয়ে খুব হাসাহাসি, হঠাৎ সাবুমামা বললেন, 'আচ্ছা লতুদি, আমি একটু ঘুরে আসছি।'

লতুদি, মানে মা, চমকে উঠে বললেন, 'ওমা এখন আবার কোথায় বেরোবি ? আর এক ঘণ্টা পরেই 'সময়'।

সাবুমামা বললেন, 'আমি দশ মিনিটে ঘুরে আসছি।'

মা ভাবলেন, ছেলেমানুষ তো! বোধহয় শখ হয়েছে ভাগ্নীকে কিছু উপহার দেবে, তাই কিনতে বেরোনো হলো। তাই বেশী কিছু বললেন না, শুধু চেঁচিয়ে বললেন, 'দেরি করিস না—'

সাবুমামাও চেঁচিয়ে বললেন নিচে থেকে, 'যাবো আর আসবো।'

ব্যস্! ওই পর্যন্ত।

সেই যাওয়ার পর এই আসা!

এর থেকে অদ্ভুত ব্যাপার আর কি হতে পারে ?

প্রথমটা তো দেরি দেখে মা খুব রাগ করতে লাগলেন, দিদিমা

আর মাসিমা আবার মায়ের ওপর রাগ করতে লাগলেন, 'তুই যেতে দিলি কেন? ওকে দিয়েই যখন আসল কাজটা করানো হচ্ছিল—'

কিন্তু কে জানতো এমন কাণ্ড হবে?

রাগের মাথায় বাবা বললেন, 'ছেড়ে দাও তোমার ভাইয়ের আশা, এখন আমার ভাই-ই ভাত খাওয়াতে বসুক। যতো সব দায়িত্বজ্ঞানহীন!'

হলও তাই, কাকা দিদিকে ভাত খাওয়ালেন। কিন্তু ক্রমশঃ বেলা যখন অনেকটা গড়িয়ে গেল, তখন রাগটাগ উপে গিয়ে সকলের ভয় ঢুকল।

গেল কোথায় ছেলেটা?

কোনো বিপদ আপদ হলো না তো?

এতোটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হবার কথা নয়! অন্ততঃ খাবার সময়টাও তো হয়েছে? পেট চুঁই চুঁই করছে না? সকাল থেকে বেশ কয়েকবার খোঁজ করেছেন, কি কি রান্না হচ্ছে?'

সেই ছেলে খিদের সময়ও আসছে না?

তবে নির্ঘাৎ বিপদ!

বিপদই অবশ্য।

লোকে রাস্তার বিপদের কথাই ভেবেছে, মানে গাড়ী চাপা-টাপা, কিন্তু দেখা গেল এক অভাবিত বিপদ তোলা ছিল।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ হঠাৎ একটা অচেনা লোক ঝট্ করে বাইরে থেকে মার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। সাবুমামার হাতের লেখা চিঠি।

দিয়েই একেবারে হাওয়া।

কোথায় যে চলে গেল!

চিঠি খুলে পড়ে সবাই তাজ্জব।

সাবুমামা লিখেছেন, 'লতুদি, খুকুকে ভাতটা খাইয়ে আসতে পারলাম না, এজন্যে মাপ করো। ভেবে দেখলাম আর দেরি করা

ঠিক নয়। তাই বেরিয়ে পড়লাম। সংসার অনিত্য, জীবন ক্ষণভঙ্গুর, তাই যিনি নিত্য সত্য, সেই ঈশ্বরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। খুকুকে ভালবাসা জানিয়ে যাচ্ছি।'

উৎসব বাড়ি, বাড়ি ভর্তি লোক, চিঠি পড়ে তো সবাই থ! এ কি সত্যি ? না ইয়ার্কি ?

বাবা, কাকা, বড় মেসোমশাই সবাই বলতে লাগলেন, 'ডেঁপোমি, ইয়ার্কি, একবাড়ি লোককে খুব একখানা রাম ঠাট্টা দিয়েছে ইয়ারটা।'

কিন্তু মা দিদিমারা কাঁদতে লাগলেন। বললেন, 'ভালোমন্দ খেতে এতো ভালবাসে ছেলেটা, আজকের দিনেই এই ইয়ার্কি মারবে এ হতে পারে না। নিশ্চয় কোনো ভণ্ড সাধু ভুলিয়ে বার করে নিয়ে গেছে। কোনোখানে কিছু নেই, সহজ ছেলে, অমনি ঈশ্বর সন্ধানে বেরিয়ে গেল ?'

কিন্তু গেলো তো!

আর তো এলো না। 'আমাদের বাড়ি থেকেই হারিয়ে গেল সাবু—' এই ছিল মার বেশী আক্ষেপ।

সাবুমামার এই গল্প আমার শুনে শুনে মুখস্থ, জন্মাবধিই শুনছি। আর দেয়ালে টাঙানো একটা গ্রুপ্ ফটোতে সাবুমামার ছবিও দেখেছি, কাজেই সাবুমামা আসছেন শুনে পর্যন্ত আমারও উত্তেজনা কম হচ্ছিল না।

কিন্তু আসছেন, এ খবরটা দিলো কে ? দিলো ওঁর চিঠিই। এই বাইশ বছর পরে, যখন সাবুমামা সম্পর্কে সকলে প্রায় হতাশ হয়ে গেছে, এবং বেঁচে আছেন কি নেই এই মনোভাব, তখন এই এক দীর্ঘ পত্র এসে হাজির।

লিখেছেন—

'লতুদি, জানি না তুমি এখনো বেঁচে আছো কি নেই। জানি না আর কে কে আছে না আছে, তবু আন্দাজে ভর করে তোমাকেই চিঠি লিখছি। চিঠি পেয়ে নিশ্চয় অবাক হয়ে ভাবছো, মরা মানুষটা

কি কবর থেকে উঠে এসে চিঠি লিখছে? অবস্থাটা প্রায় তাই নয় কি? আমাকে এতোদিনে নিশ্চয় তোমরা খরচের খাতায় লিখে রেখেছো? তাই ভাবছি আমাকে তোমরা কি ভাবে নেবে। এতো কাল পরে এ আপদ আবার কোথা থেকে এলো ভেবে রেগে যাবে না তো?

খুকুর মুখে ভাতের দিন হঠাৎ ও ভাবে চলে আসাতে তোমরা কি ভেবেছিলে কে জানে! কতো দিন পর্যন্ত যে ওই কথাটা ভেবে ভেবে মনে কষ্ট হয়েছে! অথচ হঠাৎ কি যে ঝোঁক চাপলো!

এতোদিন পরে আসল কথাটা খুলে বলি—এখন লিখতে এতো হাসি পাচ্ছে। শুনলেও তোমরা গায়ে ধুলো দেবে। কিন্তু সেদিন মনের ভাব সাংঘাতিক।...দশ মিনিটের জন্যে বেরিয়েছিলাম একখানা রুমাল কিনতে, রুমাল ছিল না আমার। জামাইবাবুর বাড়িতে এসেছি, মানমর্যাদা থাকা দরকার তো। পথে বেরিয়েই হঠাৎ একটা বন্ধুর সঙ্গে দেখা। আমার কাছেই আসছে।

কি ব্যাপার?

ও বললো, 'ব্যাপার গুরুতর। স্যারের কাছ থেকে ভেতরের খবর শুনে এলাম তুই আর আমি দুজনেই ফেল করেছি।'

শুনে পৃথিবীটা বোঁ করে ঘুরে গেল, সেই সঙ্গে মাথা, বুদ্ধি, হিতাহিত জ্ঞান, সব। সব ঘুরে গেল।

বললাম, 'যাঃ'।'

বন্ধুটা বললো, 'মিছিমিছি বানিয়ে বলে আমার লাভ?'

'তুই তো ভুলও শুনতে পারিস!' বললাম আমি শুকনো গলায়। কারণ গলায় তখন রস-টস কিছুই ছিল না।

বন্ধু বললো, 'ভুল শুনবো? টাকু স্যারের কাছে? (বাংলার মাষ্টার মশাইকে আমরা 'টাকু স্যার' বলতাম।) টাকু স্যার আমার মাথায় চাটি বসিয়ে বসিয়ে বলেছেন, যাও দুই বন্ধু এবার মাঠে গিয়ে হাল-বলদ ঠ্যালো গে। যেমন দুই বন্ধুর প্রাণে প্রাণে ভাব, তেমনি

তুই বন্ধুই একই দুঃখের সাগরে পড় গে। আড্ডা! সারা ক্লাস কেবল আড্ডা! এখন বোঝো! আড্ডা দেওয়ার কি সুফল! গভীর গাড্ডা! একেবারে বিরাট গাড্ডু! ইউনিভার্সিটির ঠাকুরদারও সাধ্যি ছিল না তোদের পাশ করায়। যাঃ বেরো!

তা আমি তো ঠিক করেছি—।' বন্ধু বললো, 'আর বাড়ি ফিরছি না। এই যে এক হাফ প্যাণ্ট শার্টে চলে এসেছি এই নিয়েই সংসার ত্যাগ করবো।'

'সংসার ত্যাগ করবি?' আমি তো তাজ্জব। বন্ধু বললো, 'করবোই তো। না তো কি বলতে চাস এই পোড়ার মুখ নিয়ে গিয়ে বাড়িতে দেখাবো? নেভার। পকেটে তিনটে টাকা আছে, সেজদি পশম কিনতে দিয়েছিল। ওইটা নিয়েই কেটে পড়বো। ওর থেকে আনা আস্টেক নিয়ে গেরুয়া রং কিনবো। শার্টটা আর প্যাণ্টটা ছুপিয়ে নেবো। ব্যস্। আর কিছুটি নয়। তারপর আমি আছি আর ভগবান আছে।'

আমি হাঁ করে ওর কথা শুনছি।

শুনে কি যে হলো আমারও মনে হলো, আর ফিরবো না। সেই বাড়ি ভর্তি লোকের মাঝখানে হঠাৎ যদি প্রকাশ পেয়ে যায় ওই ভয়ানক খবর। তার থেকে মরাও ভাল।

বললাম, 'তবে চল্, আমিও যাই তোর সঙ্গে।'

ও বললো, 'না না, তুই কেন মিছে বাড়িতে বকুনি খাবি—'

আমি রেগে বললাম, 'বোকার মত কথা বলিস না। চিরকালের মত বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। বকুনিটা খাব কি করে?'

'কিন্তু তুই কেন শুধু শুধু—'

বললাম, 'শুধু শুধু কেন, তোর আমার দু'জনের তো একই কারণ।'

ব্যস্ ওর হাতে সেই পশম কেনার তিন টাকা, আর আমার হাতে রুমাল কেনার আট আনা, এই নিয়ে দুটো উজবুক বেরিয়ে পড়লাম

সংসার ছেড়ে।

যে হতভাগা আমাকে এ প্ররোচনা দিল, সে বললো, 'তুই যদি আমার সঙ্গী না হতিস, হয়তো স্রেফ গঙ্গায় ডুবে মরতাম!'

পরে ভেবে কি হাসিই পেয়েছে যে সামান্য একটা পরীক্ষায় ফেল হয়ে স্রেফ গঙ্গায় ডুবে মরার পরিকল্পনা! কম বয়সে ছোট জিনিসগুলো কি বড়ই লাগে!

গঙ্গায় ডুবে মরার বদলে আমরা সন্ন্যাসী হওয়া স্থির করলাম। ও বুদ্ধুটা বলল, 'সন্ন্যাসী হলে, খাওয়া দাওয়ার জন্যে চিন্তা করতে হয় না, পরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিব্যি চলে যায়, অথচ আত্মার উন্নতি হয়।' আমিও তাতে ভিজলাম।...হ্যাঁ ভালো কথা, সেই লোকটা চিঠিখানা পৌঁছে দিয়েছিল তোমাদের যাতে আমার ওই সাধু হবার সাধু সঙ্কল্পটি ব্যক্ত করেছিলাম? একটা মুদির দোকানে বসে তাদের কালি কলম চেয়ে নিয়ে চিঠিটা লিখে বন্ধুর চেনা একটা মুটেকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে চলে গেলাম হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশে।

কিন্তু মানুষ যা ভাবে তা যদি হতো! ভগবান অন্যটিই ভেবে বসে থাকেন। সন্ন্যাসী হওয়ার বদলে আমরা কিই না হলাম! কখনো কুলি, কখনো হোটেলের চাকর, কখনো সার্কাসের দলে, কখনো শখের যাত্রার দলে, তারপর হঠাৎ ভারতবর্ষের মাটি ছেড়ে একেবারে দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানেই কাটল বহুদিন, এতদিন পরে ফিরেছি দেশে। বন্ধুটি ফিরে এসেছিল আরো আগে। শুনেছি কলকাতায় ফিরে বিয়ে থা করে সংসার করছে। একটা চিঠি দিয়েছিল আমায়, বলেছিল, 'চলে আয়। এখন মনে হচ্ছে কি ভুলই করেছিলাম সেদিন। শুধু নিজের জীবনটাই নষ্ট করেছি তা নয়, তোরটাও নষ্ট করেছি। তবু যদি ফিরে এসে আবার বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়াস, বুঝব 'আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল।'

ওর প্রায়শ্চিত্ত করাতে নয়, ভাবছি এমনিই যাই। হঠাৎ যেই মনস্থ করেছি সেই যেন আর ধৈর্য ধরছে না। দিন গুণছি। অথচ

ভয়ও আছে—তোমরা বেঁচে আছ কিনা, তোমরা আমায় নেবে কিনা। যাই হোক গিয়ে তো পড়ি। টাকা পয়সা কিছু করে ফেলেছি, সেগুলোর সদ্ব্যয় করারও তো একটা পথ চায়। ইতি—

সাবু।

চিঠিখানা যেদিন এলো, সেদিন বাড়িতে বিরাট এক কনফারেন্স বসে গেল। বড় মাসি, বড় মেসো এলেন, আমার পিসিমা এলেন, কাকা বাবা মা সবাই মিলে চিঠিটাকে ছুবার তিনবার পড়া হলো, মা আর মাসিমা কাঁদতে লাগলেন, বললেন, 'কি ভুল করেই চলে গেল। ফেল তো করেনি, শুধু থার্ড ডিভিশান হয়েছিল।'

বাবা বললেন, 'একই কথা। সে যাক, সাবুর পুরনো লেখা মিলিয়ে দেখো মেলে কিনা।'

কিন্তু সাবুমামার 'পুরানো লেখা' আবার কে কোথা থেকে বার করবে?

সাবুমামা এর আগে কবে কাকে চিঠি লিখেছেন? 'ওর ইস্কুলের খাতাটাতা নেই?' বাবা শুধান।

কাকা বললেন, 'লেখাপড়া তো করতো।'

'সে তো এ বাড়ীতে নয়'—মা বললেন, 'সে তো মার কাছে। মা কতদিন হল মারা গেছেন। কোথায় কি তার ঠিক নেই।'

'তবে? কে বলতে পারে জাল নয়?' কাকার প্রশ্ন।

বাবা বললেন, 'এ রকম ঘটনা ঢের শোনা যায়, অনেক দিন নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া কোনো লোকের নাম জাল করে অন্য লোক এসে বাড়িতে ঢোকে, আদর খায়। বিষয় সম্পত্তি নেয়।'

মা রেগে বললেন, 'অন্য লোক এত কথা জানবে কি করে? ও যে খুকুর মুখে ভাত দেবার দিন চলে গেছে, অন্য লোক জানে সে কথা?'

'কেন জানবে না?' বাবার জিজ্ঞাসা।

কাকা বললেন, 'ওই গল্পটা তুমি এই বাইশ বছর ধরে অন্ততঃ

বাইশ হাজার বার বলেছ বৌদি।'

'আমি তো চেনা লোকের কাছে বলেছি।'

'আহা, তারা আবার তাদের চেনা লোকের কাছে বলেছে, আর তারা তাদের চেনাদের কাছে বলেছে। শেষ ফল এই!'

বড় মাসিমা গম্ভীরভাবে বললেন, 'কথাটা খুব ভুল বলনি ভাই, তবে কথা হচ্ছে এখানে আর বিষয় সম্পত্তির কি আশা আছে?'

'কোনো বদলোকও তো হতে পারে? চুরি ডাকাতির মতলবে—'

'তা আমরা এতগুলো লোক কেউ তাকে চিনতে পারব না?' মা বললেন রেগে উঠে।

'সেটাই হচ্ছে শেষ ভরসা।' বাবা নিশ্চিন্ত।

বড় মেসোমশাই বললেন, 'তার শরীরের কোন চিহ্ন-টিহ্ন মনে আছে তোমাদের?'

'কেন মনে থাকবে না?' মা বললেন, 'বাঁ কানের পিঠে বড় একটা জড়ুল আছে না ওর?...দিদি তোর মনে নেই?'

মাসিমা বললেন, 'তুই বললি তাই মনে পড়ল। তবে আরও একটা কি যেন ছিল।'

'তুই তো অনেক বড়। আমি আর সাবু প্রায় খেলুড়ের মত ছিলাম। সর্বদা দেখেছি, আমার মনে আছে।'

'তাহলে এসে দাঁড়ানো মাত্র কান উল্টে দেখতে হয়।' বলে হাসতে লাগলেন বাবা।

হঠাৎ মা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে আসল কথাটাই যে মনে পড়েনি, সাবুর ডান পায়ে যে ছটা আঙুল।'

'অ্যাঁ, তাই নাকি?'

সবাই যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

তাহলে আর চিনতে ভুল হবে না।

ছটা আঙুল! ওটা তো আর বানানো যাবে না।

ব্যস্ তারপর থেকেই লেগে গেল তোড়জোড়। বাড়ি নিয়ে

তচ্‌নচ! কোন্ ঘরটায় থাকবে সাবুমামা, কি কি ব্যবস্থা হবে।

আসলে মার উৎসাহই সবচেয়ে বেশী।

বড় মাসিমার কাছে তো আর চিঠি দেন নি, দিয়েছেন মার কাছে। কারণ মার সঙ্গে সাবুমামার শুধু দিদি-ছোট ভাই সম্পর্ক নয়, বন্ধুর মতো। মা শ্বশুরবাড়ি চলে এলে রোজ দেখতে আসতেন সাবুমামা।

তাছাড়া—এই বাড়ি থেকেই হারিয়ে গেছেন, সেটাও মার প্রাণে একটা দাগার মতো ছিল।

'সাবুমামা আসার আগের দুদিন মার যেন আহার নিদ্রা নেই, সর্বদা ঘুরে ফিরে সেই কথা—

'সাবু খিচুড়ি খেতে এতো ভালবাসতো, বলতো, দুবেলা খিচুড়ি দিলেও আমি খেতে পারি। সাবু বেগুন মোটে খেতে পারতো না। বলতো, কোন রস নাই যার, তার নাম আগুন, কোন গুণ নাই যার, তাকে বলে বেগুন!'

আবার বলছেন, 'আমসত্ত্ব আনিয়ে রাখলাম। সাবু কি ভীষণ ভালবাসে।......পোস্তদার ছোট ছোট ভাজা বড়ি দিলাম চারটি—সাবু ভালবাসে।......'

আবার বলছেন, 'এমন কিছু বয়েস হয়নি সাবুর। এবার ওকে ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে দেব। আসুক না। কনে খুঁজছি।'

এ বাড়িতে সকলেরই দেখা লোক সাবুমামা, এমন কি দিদিও দাবি করতে পারে—'দেখেছে'। কারণ দিদি তখন হামাই দিক আর মুখে ভাতই দিক, চোখ তো ফুটেছিল? কাজে কাজেই দেখেছে।

আমিই শুধু রইলাম বাকি।

আমার কাছে একদম অদেখা।

আপন মনে ভাবতে থাকি কেমন হবেন সেই সাবুমামা। জীবনের পনেরো-ষোলটা বছর যাঁর আফ্রিকার জঙ্গলে কেটেছে, আরও পাঁচ-ছ বছর কতো কতো জায়গায়, তিনি কি আর আমার মতো একটা স্কুলের ছেলেকে পুঁছবেন? হয়তো কথাই বলবেন না।

উদ্বেগ আগ্রহ আমারও কম নয়।

কেমন করে কথা বলবো, কেমন করে চেনা করবো, উনি কি ভাবে কথা বলবেন, এই সব ভেবেই চলেছি কদিন ধরে। দিদিকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনা হয়েছে সাবুমামার পদার্পণের মুহূর্তে থাকবার জন্যে, ঠিক যেন একটি নাটকের আরম্ভের মতো।

অবশেষে এলো সেই মহামুহূর্ত।

ঘটলো সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটি।

ড্রাইভারকে নিয়ে মা গিয়েছিলেন স্টেশনে, কারণ মা ছাড়া আর যদি কেউ চিনতে না পারে? কিন্তু শুনলাম —স্টেশনে নেমেই মা ওঁকে চিনবেন কি, উনিই মাকে চিনে ফেলে 'লতুদি, লতুদি' করে হৈহৈ শব্দে নেমে পড়েছেন।

তারপর আর কি!

নিয়ে চলে আসা।

ও বাবা এই রকম সাবুমামা!

এ যে প্রায় একটি 'সাহেব' বললেই হয়। যেমনি লম্বা চওড়া তেমনি ফর্সা। গলার শব্দও রীতিমত বাজখাঁই। হাসি একেবারে ছাদ ফাটানো!

আমি তো দেখেই মোহিত হয়ে বসে আছি।

আর ভাবছি—কতোক্ষণে ভাব করতে পাবো।

কিন্তু বড়োরাই তো নিয়ে হৈচৈ করছে।

কিংবা বলতে পারা যায় সাবুমামাই সকলকে নিয়ে হৈ চৈ করছেন।

মায়ের সঙ্গে সিঁড়িতে উঠে এসেই কাকার ছোট্ট ছেলেটাকে দেখে টপ করে তুলে নিয়ে একেবারে শূন্যে।

'ওরে ওরে কি সর্বনাশ!'

মা শিউরে ওঠেন, 'তুই যে একেবারে ডাকাত হয়ে গেছিস! অতো লোফালুফি করিস নে বাবা, ওর অতো অভ্যেস নেই।'

সাবুমামা ছাড়েন না, বলেন, 'অভ্যেস করতে হবে! শক্ত হতে হবে না? কে এ? তোমার ছোট ছেলে না কি?'

মা বললেন, 'ধ্যেৎ! ও তো ঠাকুরপোর ছেলে।'

'ওঃ সুবলদার!'

সাবুমামা এতক্ষণে কাকার দিকে তাকালেন, 'আরে সুবলদা, তোমাকে তো এতোক্ষণ দেখতেই পাইনি। আছো কেমন? খবর কি?'

কাকার সঙ্গে সাবুমামার বয়সের তফাৎ খুবই সামান্য, তাই বোধহয় তুমিই বললেন।

কাকা হাসলেন, 'খবর তো তোমারই। আমাদের আর কি। যা ছিলাম, তাই আছি। তুমিই পুরো বদলে গেছ।'

সাবুমামা হেসে তাঁর ঘন চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে বলেন, 'বদলে গেছি না? তা পৃথিবীটাই যখন অহরহ বদলাচ্ছে—'

আমি একটু অবাক হয়ে দেখছি—এই কদিন ধরে মার যে উৎসাহ দেখেছিলাম, সেটা যেন কেমন মিইয়ে গেছে। যেন মা যে আশা করে ছুটে গিয়েছিলেন, সে আশায় কিছুটা নিরাশ হয়েছেন। কেন রে বাবা?

চিঠির কথা মত ঠিক সময়েই তো এলেন সাবুমামা, আর কি পেল্লায় পেল্লায় সুটকেস ভর্তি করে কত কিই না এনেছেন! তাছাড়া কি সুন্দর হাসিখুশি!

কিন্তু মার যেন মন উঠছে না।

মা এই সময় শুকনো গলায় বলে উঠলেন, 'কিন্তু তুই বাবু বড্ডো বেশি বদলে গেছিস। সেই সাবু বলে মনেই হচ্ছে না।'

'কি মনে হচ্ছে?' সাবুমামার প্রশ্ন।

তারপরে হা হা করে হেসে ওঠেন, 'জাল সাবু?'

'ধ্যেৎ, কি যে বলিস!' মা অপ্রতিভ হাসি হাসেন।

'আহা, তুমি বোধহয় সেই গোঁফ-না-ওঠা সদ্য ম্যাট্রিক পরীক্ষা

দেওয়া পুঁচকে ছেলেটাকেই দেখবে বলে আশা করে বসে আছো?'

'তা কেন? তবে—'

'তবে কি?'



'বড্ডো বেশী বড় হয়ে গেছিস তুই। বাবাঃ! দরজার কাঠে মাথা ঠেকছে তোর, জুতোর মাপ নৌকোর মতো! তোকে দেখে যেন সমীহ আসছে।'

'তবে তো খুবই ভাল—' সাবুমামা বলে ওঠেন, 'তুমিই তাহলে আমাকে 'দাদা' বলবে।...কী বলেন জামাইবাবু?'

বাবা শুকনো হাসি হেসে বলেন, 'আমি আর কি বলবো!

তোমাদের ভাইবোনের মধ্যেকার কথা।'

'বাঃ আমাদের ভাইবোনের মাঝখানে আপনি তো চীনের প্রাচীরের মতো বর্তমান।' সাবুমামা বলেন, 'আপনারই বা কি কম বদল হয়েছে মশাই? চুল পাকিয়েছেন। টাক পড়িয়েছেন। দাঁতও পড়িয়েছেন একখানা দেখছি।'

'বাঃ বয়েস হচ্ছে, হবে না এ সব?' বলে বাবা তাড়া লাগান, 'যাক্ এখন মুখ-টুখ ধোও, চা-টা খাও, গল্প করবার জন্যে তো অনেক সময় পড়ে আছে।'

সাবুমামা একটু গম্ভীর হাসি হেসে বলেন, 'তেমনি গল্পও পড়ে আছে মহাভারতের বেশী। মহাদেবের মতো পাঁচটা মুখ থাকলে সেই পঞ্চমুখে কথা বলতাম।'

'কেন, রাবণের মতো দশটা নয় কেন?' কাকা হেসে বলেন, 'সেটা তো আরো ভালো হত।'

তারপর মা বললেন, 'ঘুরেছিস তো আফ্রিকার জঙ্গলে জঙ্গলে, এতো সব রামায়ণ মহাভারত শিখলি কবে? এখনকার ছেলেরাই তো জানে না।'

সাবুমামা একটু হেসে বললেন, 'দেশ থেকে দূরে থাকলে দেশের জন্যে যতোটা ভালবাসা থাকে, দেশের মধ্যে থেকে হয়তো ততটা থাকে না লতুদি। সেই পনেরো ষোল বছর বয়সের যা বাংলা জ্ঞান তাই সম্বল করে কেবল চেষ্টা করে বাংলা পড়েছি। যদিও বই পাওয়া খুবই দুর্লভ ছিল। এক ভদ্রলোক 'প্রবাসী' পত্রিকা রাখতেন, সে যে কি অমূল্য নিধি করে ওখানকার বাঙালীরা পড়তো। তারপর ফিরে এসে চট্টগ্রামে থেকেছি কিছুদিন, তারপর উত্তরবঙ্গে, অবশেষে এই তোমাদের কাছে।'

'আর তোকে যেতে দিচ্ছি না।' বললেন মা।

সাবুমামা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আচ্ছা লতুদি, খুকুকে সেদিন কে ভাত খাইয়েছিল?'

শুনে তো সবাই হেসেই অস্থির।

'বাবা! সেই কথা এখন? যেন কালই ঘটেছে। কে আর খাওয়াবে? রাগ দুঃখের মধ্যে ওর কাকাকেই খাওয়াতে বলা হলো।'

'যাক সুবলদা, তুমিই তাহলে জিতে গেলে।' সাবুমামা বলেন, 'মনে আছে আমি ভাত খাওয়াবো শুনে তুমি খুব রেগে গিয়েছিলে? বলেছিলে মামার থেকে কাকার অধিকার অনেক বেশী! কাকা বাড়ির লোক। মামা কুটুম বাড়ির। দাদার 'বড়ো কুটুম্ব' তুমি।'

কাকা বলে ওঠেন, 'হবে হয়তো, আমার তো মনে নেই।'

'তা সেই খুকুর খবর কি? বিয়ে-টিয়ে হয়ে গেছে নাকি?'

দিদি লজ্জায় মুখ নিচু করে হাসতে থাকে। সাবুমামা বলেন, 'বাপ্‌স্‌! সেই হামা দেওয়া মেয়েটি এতো বড়ো হয়েছে?'

তারপর প্রায় জোর করেই সাবুমামাকে মুখ-টুখ ধুতে পাঠানো হলো। এবং সাবুমামার জন্যে যে ঘর ঠিক করে রাখা হয়েছিলো, খুলে দেওয়া হলো।

সাবুমামা কিন্তু হৈ-চৈ করে উঠলেন, 'না না একি! একা আমার জন্যে এতো সাজানো গোছানো ঘর। এর কোনো মানে হয় না। আমি সকলের সঙ্গে একঘরে বেশ থাকবো।'

মা-বাবা বললেন, 'তা কি হয়? তুমি বরাবর বাইরে থেকেছো, একা থেকেছো—'

'আহা, সেই জন্যেই তো সকলের সঙ্গে থাকতে চাই। বেশ, আমার কাছে তাহলে বাড়ির ছোট ছেলেরা শুক। এটি কে? ভাগ্নে বোধহয়?'

এতোক্ষণে আমার দিকে নজর পড়লো।

আমার খুবই অভিমান হলো, চুপ করে থাকলাম।

সাবুমামা ফট্‌ করে আমাকে প্রায় তুলে ধরে এক পাক ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, 'কি লতুদি? কার ছেলে?'

'আমারই সবেধন নীলমণি গুণের গুণনিধি।'

'বেশ বেশ, তুই আমার ঘরে থাকবি কেমন? গাদা গাদা গল্প শুনতে পাবি। নাম কি?'

বললাম নাম।

সাবুমামা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে সিদ্ধার্থ? বড়ো ভাল নামতো! তা' ডাকা হয় কি বলে? সিধু নিশ্চয়? নাকি বার্লি টার্লি? আমার যেমন সাবু।'

প্রায় পঞ্চমুখেই কথা বলছেন সাবুমামা। স্নানের ঘরে যেতে যেতেও কথা।

স্নানের ঘরে ঢুকতে হলো মাথা নীচু করে। বাবাঃ! কি লম্বা! আর কি স্বাস্থ্য! এতো টাইট চেহারা আমাদের তো দেখা অভ্যেসই নেই। বাড়ির সকলেই রোগা রোগা ঝোলা ঝোলা।

সাবুমামা যেন পাথরে গড়া।

তাই হাঁ করে দেখছি।

উনি স্নানের ঘরে ঢুকে যেতেই বাবা খুব আস্তে মাকে বললেন, 'কি রকম বুঝছো?' বাবার গলায় সন্দেহ। যেন এখনো ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না।

মা একটু জোর দিয়ে বললেন, 'বুঝবো আবার কি? সব কিছু কথাই তো ঠিক ঠিক বলছে।'

'কিন্তু দেখে তো কিছুই চেনা যাচ্ছে না, মস্ত এক জোড়া গোঁফই বা কেন? ওই গোঁফেই মুখটা অবাঙালী অবাঙালী লাগছে।'

মা অন্যমনা গলায় বললেন, 'হ্যাঁ'।

বাবা বললেন, 'আর একটু ওয়াচ্ করো।'

আমার কিন্তু শুনে খুব খারাপ লাগলো। এতো চমৎকার মানুষ, বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতে যেন আবহাওয়া আহ্লাদে ভরিয়ে তুললেন। তাছাড়া অতো সুন্দর দেখতে, সন্দেহের কি আছে?

বলেই ফেললাম আমি, 'বাঃ উনি যদি সত্যি নয়, তাহলে, আমাদের এতো কথা জানলেন কি করে?'

কাকা বললেন, 'তুমি ছেলেমানুষ, চুপ করে থাকো, এ বিষয়ে কোনো কথা বোলো না। আর বৌদি শোনো, আজই সিধুকে ওর ঘরে শুতে-টুতে দেবার দরকার নেই।'

মা হঠাৎ বলে ফেললেন, 'না বাবা!'

মার কথা শুনে আমি চমকে গেলাম, মা এভাবে বললেন! অথচ সাবুমামার জন্যে মা এতো আহ্লাদ করছিলেন! আমার মনে হলো সাবুমামা যদি রোগা ছোটো-খাটো কালো-টালো হতেন, তাহলে হয়তো মা স্বস্তি পেতেন।

কাকীমা আর আমিই শুধু আগে দেখিনি, কাকীমা বললেন, 'আচ্ছা ওই যে ছবিটা রয়েছে, মুখ কি সে রকম নয়?'

মা বললেন, 'গোঁফ-টোঁফ হয়ে গেছে।'

'রং ও রকম ফর্সা ছিলো না?'

'ফর্সা বরাবরই ছিলো, তবে এতো জেল্লা ছিল না। রোগা কাঠি ছিলো, ফ্যাকাসে ফর্সা ছিলো।'

'আপনার কি মনে হচ্ছে, সত্যি তিনি নন?'

মা হঠাৎ রেগে উঠে বললেন, 'কে বলেছে মনে হচ্ছে না? না যদি হবে তো, ও আমাকে স্টেশনে দেখে চিনলো কি করে?'

'তবে আর কি চিন্তা!'

বলে চলে গেলেন কাকীমা।

আমিও ভাবলাম, সত্যিই তো তবে আর কি চিন্তা! অথচ মার মনে যেন রয়েছে চিন্তা। যেন প্রাণ খুলে আহ্লাদ করতে পারছেন না।

কিন্তু যাঁর মনে চিন্তা নেই, তাঁর আহ্লাদের অভাব নেই। স্নান-টান সেরে উদ্দাম চীৎকার শুরু করে দিয়েছেন সাবুমামা, 'ভাগ্নে ভাগ্নীরা এসে যাও, এবার চিচিং ফাঁক হচ্ছে।'

আর কে শোনে কার কথা। আমি দিদি কাকার ছেলেমেয়েরা সবাই গিয়ে হাজির।

দেখি সাবুমামা ওঁর সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্যুটকেস দুটো খুলেছেন। আর তার মধ্যে থেকে একটি একটি করে বার করছেন নানাবিধ জিনিস।

কাকার ছেলে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মা, মা, দেখবে এসো—'

আর তারপর সবাই না এসে পারে না। কৌতূহল বলে কথা।

সাবুমামার মুখে হাসির আলো, 'এই দেখো বাবু মেজিক দেখো—সুলতানি কার্পেট চলে আয় চলে আয়।'

চলে এলো মানে বাক্স থেকে বেরোলো ভেলভেটের ওপর জরির কাজ করা একখানা অপূর্ব কার্পেট।

'এটা হচ্ছে মরক্কোর ওদিকের জিনিস, লতুদি এটা তোমার—।' বললেন সাবুমামা।

সত্যি বলতে মা তো মোহিত! তখন যেন আর সন্দেহ টন্দেহ নেই। আহ্লাদে গলে বললেন, 'বকিসনে বাপু; আমি নিয়ে কি করবো? এ তোর বৌয়ের জন্যে থাক।'

'বৌ? আমার বৌ?' সাবুমামা পাহাড় ফাটানো হাসি হাসেন, 'তাকে আবার কোথায় পাচ্ছো? আকাশ থেকে পড়বে নাকি?'

'আকাশ থেকে পড়বে কেন, এই মাটি থেকেই আসবে, আমি তোর বিয়ে দেব।'

'মাথা খারাপ না পাগল! এই বুড়ো বয়সে বিয়ে?'

'বুড়ো আবার কি—তোর তো মোটে সাঁইত্রিশ বছর বয়েস।'

'তা' সেটা বুঝি খুব কম হলো?'

'একেবারে বুড়ো বয়েসও হলো না। দেখ্ না বাড়িতে কি ধুমধাম লাগাই। ওই কার্পেটে বৌ এসে বসবে।'

সাবুমামা বলে ওঠেন, 'ওরে আমার কে রে! কোথাকার কাদের মেয়ে, তার জন্যে তো আমার ঘুম হচ্ছে না। এ বলে আমি তোমার কথা ভেবে ভেবে কতোদিন থেকে তুলে রেখেছি।'

তারপর আবার হাঁকলেন, 'চলে আয়, চলে আয় আফ্রিকান

জাহাজ, চায়নার রেশম থান, বর্মার হাতী, বুদ্ধ, প্যাগোডা, গোয়ার পাথরের মাল, জাপানের ছবি—।'

বার করছেন তো করছেন।

আমি তো না জিগ্যেস করে পারি না, 'এতো জায়গায় আপনি গিয়েছেন সাবুমামা?'

সাবুমামা আমার পিঠ ঠুকে দিয়ে বলেন, 'তা ঠিক নয় ভাগ্নে, তবে জাহাজের বন্দরে টন্দরে নানান মাল বিক্রী হয় তো! এই যে



হাতীর দাঁতের পেপার কাটার, ব্রোঞ্জের পেপার ওয়েট, চন্দনকাঠের পাখা, পোর্সিলেনের ফুলদানী, এ সমস্তই কিনেছিলাম গোয়ায়। এগুলো তোর।'

'বাঃ আমার কি!'

আমার তো মাথা ঘুরে গেছে।

কিন্তু সাবুমামা বলে ওঠেন, 'আরে তুই হলি তোর মার সবেধন নীলমণি! তুই নিবি না? আমি তো জানিই না, কে কে জন্মেছে ইতিমধ্যে—মেয়ে না ছেলে তাই ঠিকমতো বুঝে অনিনি। এই শাড়ি এনেছি এক গাদা, লতুদি তুই, তারপর সুবলদার বৌ, খুকু, আরো

যারা আছে ভাগ করে নিবি।…এই একটা বাঘছাল এনেছিলাম পিসিমা বসে পূজো করবে বলে, তা' পিসিমা তো স্বর্গে গিয়ে বসে আছে। জামাইবাবু এই কুমীরের চামড়াটা আপনার জন্যে—।'

'আরে সর্বনাশ, ও নিয়ে আমি কি করবো?'

'অনেক কিছু করা যায়। সাজিয়েও রাখা যায়।…সুবলদা, তোমার জন্যে এই মলক্কা বেতের ছড়িটা, আর বার্মিস্ কাটের খড়ম।'

কতো রকমের জিনিসই যে বার করছেন!

তবে শাড়ি দেখেই মা কাকীমা দিদি মোহিত। বোধহয় তিরিশ চল্লিশটা অদ্ভুত অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর সব শাড়ি।

জিনিসের স্তূপ দেখে যে সকলের সব সন্দেহ চলে গেল, তাতে আর সন্দেহ নেই।

সাবুমামা যদি সত্যি সাবুমামা না হন, তাহলে এমন করে যেখানে যা সুন্দর জিনিস দেখেছেন, কিনে কিনে এখানের জন্যে জমিয়ে রাখতেন কখনো?

মার মুখ থেকে অন্যমনস্কতা গেল।

মা বললেন, 'তুই কিন্তু ওই বিচ্ছিরি দারোয়ান মার্কা গোঁফটা কামিয়ে ফেলবি তা বলে দিচ্ছি সাবু!'

সাবুমামার আবার সেই আকাশ ফাটানো হাসি, 'কেন, গোঁফ কি দোষ করলো?'

'বিচ্ছিরি! ওতে তোকে ঠিক হিন্দুস্থানী দারোয়ানের মতো লাগছে।'

'ঈস্! চেহারাখানা দারোয়ানের মতো নাকি? এতোকাল ধরে এই চেহারাটির পিছনেই মনপ্রাণ নিয়োগ করেছি বুঝলে?'

বাবা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'সেই জন্যেই আগের চেহারার সঙ্গে কোনো মিল খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। এতো ফর্সাও ছিলে না তুমি।'

'তাই নাকি? তাহলে তো দেখছি ফর্সা হয়েও আপনাদের চিন্তায় ফেলেছি সাবুমামা হাসেন।'

বাবা বলেন, 'আপাততঃ বাপু চিন্তায় ফেলেছো এই গন্ধমাদন পর্বতটির ভার চাপিয়ে। এসব কি করেছো? না না, এতো কি! এতো খরচ করা ঠিক হয়নি।'

'আরে বাবা—একদিনে তো আর খরচ করিনি, কতোদিন ধরে কিনেছি। খুকু, এই নেকলেসটা তোর পছন্দ হয়? নানারঙের পাথর দিয়ে কি গ্র্যাণ্ড বানিয়েছে দেখেছিস? এটা যে কোথা থেকে কিনেছি মনে নেই ঠিক।'

মা যতোই বলেন, 'সব এক সঙ্গে দাতব্য করতে হবে না, থাক্‌না বাবা, তোর বিয়েতে কাজে লাগবে।' সাবুমামা ততোই হাসেন।

তারপর মা হঠাৎ জিজ্ঞেস করেন, 'হ্যাঁরে দিদির জন্যে কিছু আনিস নি?'

সাবুমামা জিভ কাটেন।

'এই রে, একদম মনে নেই। তা' বড়দি আসেন টাসেন না?'

'আজ আসবেন সন্ধ্যেবেলা।'

'ঠিক আছে, এই শাড়ি টাড়ি থেকে না হয় দু' একটা দিয়ে দিও। মানে ব্যাপার কি জানো, বড়দির কথা ঠিক ততোটা মনে ছিল না—'

মা হাসেন, 'তা' বুঝেছি।'

খাওয়ার টেবিলে আর এক পালা হৈ চৈ চলে। 'ইস্ কতোদিন বাঙলা রান্না খাইনি। আরে বড়ি ভাজা! ওঃ মনে হচ্ছে স্বর্গীয় বস্তু....না না মাংস টাংস নয়। ও তো খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেছে। মোচার ঘণ্ট রাঁধোনি?'

মা তো হেসেই অস্থির, 'বাবা ও সব তো তুই খেতিসই না। বলতিস, যতো সব কচু ঘেঁচু, ওসব মানুষে খায় নাকি?'

সাবুমামা বলেন, 'দেশ ছাড়া হয়ে পড়ে থেকে দেশের ওই কচু ঘেঁচুই তখন পরম স্বর্গীয় মনে হতো বুঝলে। ভাবতাম আর কি কখনো সেই কচু ঘেঁচুর সামনে বসতে পাবো!'

খুব হাসিখুশি করেই কাটলো খাওয়াটা।

তারপরই দেখলাম বড়োদের মনটা বেশ হালকা। আমি তো নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। গুটি গুটি ও ঘরে গিয়ে ঢুকি।

'আরে এসো এসো ভাগ্নে সাহেব!' সাবুমামা ডাকেন, 'তোমাকেই খুঁজছি। তুমি আর আমি এই ঘরের বাসিন্দা হচ্ছি কি বলো?'

আমার তো খুবই ইচ্ছে করছিল, আর—বড়োদের মনের পরিবর্তন দেখে আশাও হচ্ছিলো আর বাধা টাধা পাবো না। তাই একগাল হেসে সায় দিই।

তারপর কি তাড়াতাড়িই যে ভাব হয়ে যায়, আমার তো মনে হতে থাকে যেন চিরকালের মামা।

কাজেই 'গল্প গল্প' করে ব্যস্ত করতে দ্বিধা হয় না।

'মামা, আপনি যেখানে যেখানে, মানে যতো দেশে গেছেন, সব গল্প বলুন।'

'ওরে বাবা, সে কি একদিনে বলবার? কতো কতো জায়গা।'

'বেশ, একে একেই বলুন। আচ্ছা প্রথম চলে গিয়ে কি করলেন, সেই থেকেই শুরু করুন।'

সাবুমামা হেসে ওঠেন, 'এ রাম রাম! ছি! ছি! হুটো উজবুক আহম্মক বুদ্ধু ছেলের বোকামির আর নাস্তানাবুদ হওয়ার গল্প আবার মানুষে শোনে?'

'বাঃ তারপর তো অনেক বড়ো হলেন। কতো দেখলেন, কতো শিখলেন, সে সব গল্পও শুনবো।'

'সে সব গল্পই বলবো। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে, বুঝলি? রাত্রে না হলে গল্প জমে না। আমরা হুই বন্ধুতে রাত্রে গল্প করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জাগতাম।'

'সেই বন্ধুর কি হলো?'

'ও? ও অনেক দিন আগেই দেশে ফিরে এলো বুঝলি? ওর

আর ভালো লাগছিলো না।'

সাবুমামা একটু নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'ভালো আমারও লাগছিল না আর, লাগেও না বুঝলি? পৃথিবীটা অনেক বড়ো, একথা সত্যি, কতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, কতো অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতার ব্যাপার, কতো মানুষ, কতো বিচিত্র চরিত্র, দেখতে দেখতে একশো জন্মেও ফুরোবার নয়, কিন্তু আসলে কি জানিস? শেষ পর্যন্ত সেই জন্মকালের বাড়িটি, ছেলেবেলার পরিবেশটি, একেবারে নিকটজনের মুখগুলি, যেন হাজার হাত বাড়িয়ে টানতে থাকে। আজ দূর থেকে যেই হাওড়া ব্রীজটা দেখতে পেলাম, মনে হল যেন মায়ের কোলে ফিরে এলাম। অথচ দ্যাখ্ মাকে জন্মে চোখেও দেখিনি, ওই পিসিমার কাছেই মানুষ হয়েছি। বাবাও কোন ছেলেবেলায় মারা গেছেন, তবু প্রাণ আহ্লাদে ভরে উঠলো, নিজের জায়গায় এলাম। নিজের জায়গায় এলাম!'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'তোকে দেখে বেশ ইন্‌টেলিজেণ্ট বলে মনে হচ্ছে, তোর সঙ্গে গল্প করে সুখ হবে। ওই বন্ধুর সঙ্গে চলে এলাম না কেন জানিস? তখন আমায় টাকার নেশায় পেয়েছে, খুব রোজগার টোজগার হচ্ছে—'

'কি করতেন? ব্যবসা বুঝি?'

'ব্যবসাই, তবে ঠিক আমি নয়, একজন গোয়ানিজ্ বুড়ো কাঠ আর মধুর ব্যবসা করতো, আমাদের তার সঙ্গী করে নিয়েছিল। তার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরেছি। বুড়োর খুব ইচ্ছে ছিল আমাকে তার জামাই করে; সব বিষয় সম্পত্তি দিয়ে যাবে—একমাত্র মেয়ে—'

সাবুমামা হেসে ওঠেন, 'ওই আশায় আশায় খুব তোয়াজ করতো আমায়, কিন্তু আমি কেন মরতে একজন গোয়ানিজের মেয়ে বিয়ে করতে যাবো বল? বিয়ে করতে হলে বাংলা দেশের মেয়েকেই করবো। ছেলেবেলায় যেমন বিয়ে দেখেছি, টোপর ফোপর পরে, বাজনাবাদ্যি করে,—'

শুনে খুব মজা লাগে।

এই এতোবড়ো লম্বা চওড়া ইয়া গোঁফওলা মানুষটার কিনা টোপর পরে সানাই বাজিয়ে বিয়ে করার শখ। খুশী খুশী গলায় বলি—'তা মা তো বলেছেন আপনার বিয়েতে খুব ঘটা করবেন।'

সাবুমামা হেসে হেসে বলেন, 'সেই জন্যেই তো অনেক টাকাকড়ি নিয়ে চলে এসেছি, লতুদির হাতে তুলে দিয়ে বলবো, তুমি যা ইচ্ছে করো।'

'আপনি বুঝি পালিয়ে এলেন?'

সাবুমামা হঠাৎ চমকে ওঠেন, 'পালিয়ে এলাম? কেন পালিয়ে আসবো কেন? কে বলেছে পালিয়ে এসেছি?'

আমি ভয় পেয়ে বলি, 'না না, কেউ বলেনি, মানে সেই বুড়ো আপনাকে ছাড়লো, তাই বলছি—।'

সাবুমামা নিশ্চিন্ত হয়ে বলেন, 'আরে সে এক মজা। বুড়োর মেয়ে ফট্ করে কোথা থেকে একটা বার্মিজ ছেলেকে বিয়ে করে নাচতে নাচতে এসে হাজির 'বাবা আমি বিয়ে করেছি।' আর কি করবে বুড়ো? মাথা চাপড়ালো, কাঁদলো, মেয়েকে খুব বকলো, তারপর জামাইকে ব্যবসার পার্টনার করেও নিলো। আমার কাছে কি লজ্জা! এদিকে আমি যে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি তা তো জানে না।... তারপর থেকে আমার বন্ধু কেবলই লেখে—'চলে আয়, চলে আয়! কোথায় পড়ে থাকবি চিরকাল।' চলেই এলাম। সত্যি বলতে কি, নিজের জায়গা থেকে ছিটকে দূরে চলে গিয়ে যতোই টাকাকড়ি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হোক, কোনো পরিচয় তো নেই? 'এ একজন ইণ্ডিয়ান।—' এই আমার পরিচয়। বাঙালীও বলে না কেউ। ওই বংশ পরিচয়হীন আত্মীয় কুটুম্বহীন, সমাজ সংসারহীন শুধু 'একজন ভারতীয়'—এই স্বাচ্ছন্দ্যে কি সুখ বল? তবু তো আমার বিশেষ কেউই নেই। শুধু তোরাই আছিস।'

আমি তো হেসেই ফেলি। বলি, 'আমি যে আছি তাতো আপনি

জানতেনই না।'

'তোকে জানতাম না, কিন্তু লতুদিকে তো জানতাম। তাও কি ভয় ভয় নিয়ে এসেছি। কি জানি যদি গিয়ে দেখতে না পাই। স্টেশনে নেমেই দেখতে পেলাম। মনে হলো যেন ভগবানকে পেলাম।'

সাবুমামার হাসিটা এখন আর সেই আকাশ ফাটানো নয়, আস্তে আর গম্ভীর মতো। চোখটাও যেন জল ভরা ভরা।

কিন্তু আমার যে মন ছটফট করছে, অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প শুনি। তাই অন্য প্রসঙ্গে চলে যাই—'মামা, আপনি সিংহ মেরেছেন?'

'সিংহ! সে কি রে? হঠাৎ একথা? সিংহ মারতে যাবো কেন?'

'বাঃ আফ্রিকায় তো অনেক সিংহ আছে—।'

সাবুমামা বলেন, 'তোর তো বেশ লজিক্‌ জ্ঞান। আফ্রিকায় অনেক সিংহ আছে, কাজেই মারতে হবে! আরে পৃথিবীতে তো অনেক মানুষ আছে, মারবি তুই?'

'তা কেন! বাঘ সিংহ তো শিকারেরই জিনিস—'

'কে বলেছে তোকে শিকারেরই জিনিস?'

সাবুমামা অমন বীরপুরুষের মতো দেখতে, কিন্তু মনটা দেখছি খুব নরম, তাই বলেন, 'কেন শিকারের জিনিস?'

'বাঃ ওরা কি ভীষণ হিংস্র প্রাণী—'

সাবুমামা সোজা হয়ে উঠে বসে বলেন, 'কিছু হিংস্র প্রাণী নয়। ওরা নিজেদের জঙ্গল রাজ্যে ঘুরে বেড়ায়। খিদে পেলে প্রাণী মেরে খায়, ওটা প্রকৃতির নিয়ম। হিংস্র প্রাণী যদি বলিস, মানুষের মত হিংস্র প্রাণী আর ত্রিভুবনে নেই। মানুষ খিদে অখিদের ধার ধারে না। শুধু হিংসার জন্যেই হিংসা করে। গভীর অরণ্যের মধ্যে বাঘ সিংহ হাতী গণ্ডাররা আছে নিশ্চিন্ত মনে নিজ নিজ এলাকায়। মানুষ সেখানে হানা দিয়ে জাল ঘিরে, ফাঁদ পেতে কৌশল করে তাদের হত্যা করছে। কেন? কোন কারণ নেই। শুধু মারব বলেই মারা। …পাখিরা মনের আনন্দে আকাশে উড়ছে। মানুষ অমনি গুড়ুম

গুড়ুম গুলি করতে বসলো। মাছেরা জলের তলায় খেলে বেড়াচ্ছে। মানুষ জাল ফেলে তাদের ধরতে বসলো। যেন জগতে আর খাবার জিনিষ নেই…আসলে খাবার জন্যে নয় মারবার জন্যেই মারা! জলে স্থলে আকাশে পাতালে যেখানে যতো রকম প্রাণী আছে, সবাইকে মারা চাই মানুষের। বল্ তবে মানুষ সব থেকে হিংস্র প্রাণী কিনা?'

সাবুমামার কথাগুলো বেশ নতুন ধরনের।

এরকম কথা কই আর কাউকে তো বলতে শুনিনি।

বুঝতে পারলাম শিকারের গল্প শোনা হবে না। শিকার ফিকার উনি করেননি কখনো।

সাবুমামার এখন অন্য ভাব এসে গেছে। তাই সেই কথাই বলতে থাকেন, 'এমনিতে কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু ভাবলে কেমন লাগে বল, মৌমাছির মতন ক্ষুদ্দুর প্রাণী, কোথা থেকে না কোথা থেকে তিল তিল করে মধু সংগ্রহ করে মৌচাক গড়ছে, পরে নিজেরা গুছিয়ে বসে খাবে বলে। মানুষ গিয়ে তাদের গায়ে ধোঁয়া লাগিয়ে উড়িয়ে দিয়ে নিয়ে এল সব মধু লুঠ করে। ভাবলে নিজেদের ওপর ঘৃণা আসে না? মৌচাকের মধু লুঠ করা আমার সব থেকে ঘৃণ্য কাজ মনে হয়। অথচ ওই করেছি কতো বছর ধরে। আর ভাল লাগে? …এবার ভেবেছি একটা ভাল ব্যবসা করে বাকি জীবনটা কাটাব।'

সাবুমামা যে আর চলে যাবেন না তা বুঝতে পারছি! তাই খুব ভাল লাগছে।

কিন্তু আমাদের বাড়ীতেই কি থাকবেন?

কে জানে!

আমার দিদিমার সেই বাড়িটায়, যেখানে সাবুমামা থাকতেন আগে, সে বাড়িটা তো ভাড়া দেওয়া আছে। যদি এখানেই থাকেন বেশ হয়।

আমাদের এই বাড়িতে তো আমার সঙ্গে কেউ কথাই বলে না! কথার মধ্যে কথা, 'সিধু, সারাক্ষণ তো গল্পের বইই পড়ছিস দেখছি, পড়ার বইটা কখন ছোঁওয়া হবে? …সিধু, ইস্কুল থেকে ফিরতে এত

দেরী হলো যে? কোথায় গিয়েছিলি?...সিধু, তোর দ্বারা তো সংসারের একটা কাজ হয় না, এত ঘুরে বেড়াতে পারিস। একদিন রেশনটা এনে দিতে পারিস না?' আর না হয় তো—'সিধু ওঠ্, সিধু মুখ ধো। সিধু শীগগির নেয়ে নে। সিধু ভাত ফেললি কেন? সিধু ঠাণ্ডা লাগাস নি। সিধু রোদে বেরোসনি'—এই হাড় জ্বালানো নির্দেশ! ব্যস্! 'সিধু আয় দুটো গল্প করি'—একথা কেউ বলে না।

সাবুমামাই প্রথম বললেন সে কথা। সাবুমামাই প্রথম আমায় দেখে বুঝলেন, আমি ইন্‌টেলিজেন্ট! সাবুমামাকে ভাল লাগবে না?

সারা দুপুর সাবুমামার সঙ্গেই লেগে পড়ে থাকলাম।

সাবুমামার কৌতূহল আমাদের সম্পর্কে, আমার কৌতূহল সাবুমামার সম্পর্কে। আমি যতো জানতে চাই, সাবুমামা ওই সব উল্টো-পাল্টা জায়গায় গিয়ে কি খেয়েছেন, কি পরেছেন, কি করেছেন? সাবুমামা তত জানতে চান আমাদের কে কোথায় আছে, দিদির কোথায় বিয়ে হয়েছে, কাকার কি ছেলেমেয়ে। বাবার রিটায়ার করতে আর কতদিন আছে। দিদিমা কবে মারা গিয়েছেন, কি হয়েছিল তাঁর। সেই বাড়িটায় কে আছে এখন। বড় মাসিমার ক'জন ছেলেমেয়ে। এই সব।

ওই সব বাজে খবরগুলো জেনে যে কি হবে সাবুমামার।

'চল্ তোকে সার্কাস দেখিয়ে আনি।' বিকেলবেলা বললেন সাবুমামা।

আমার তো আহ্লাদে হৃৎকম্প!

কতো দিন যে সার্কাস দেখিনি! কেউ নিয়েও যায় না। একাও যেতে দেয় না। শুনে তো আমি এক পায়ে খাড়া।

কিন্তু বাদ সাধলেন কাকা। বললেন, 'আজই সার্কাসে নিয়ে যেতে চাওয়ার মানে? দাদা তুমি কি বল?'

দাদা, মানে বাবা বললেন, 'আমি আর কি বলব? নাচিয়েছে যখন, ছাড়বে কি? কোথায় সার্কাস?'

আমি বললাম, 'হাওড়া ময়দানে!'

'ওরে সর্বনাশ! সেখানে নিয়ে যাবে?' কাকা গলা নামিয়ে বলেন, 'আমরা এই কলকাতায় রয়েছি আমরা জানি না কোথায় সার্কাস হচ্ছে, সাবুবাবু হাওড়ায় পা দিয়েই জেনে নিলো? তাজ্জব! ....সারাদিন কি এত কথা হলো রে সিধু?'

আমার তো রাগে চোখে জলই এসে গেছে। ঠিক জানি কাকা ওই সার্কাস যাওয়াটি পণ্ড করবেন।

বললাম রেগেমেগে, 'কি আবার কথা? আমি ওঁর কথা জিগ্যেস করলাম। উনি আমাদের কথা—'

'আমাদের কথা মানে? আমাদের কি কথা?' কাকার কথায় বেশ উত্তেজনা ফুটে ওঠে।

আমি অবাক হয়ে যাই।

এতে এতো উত্তেজিত হবার কি আছে?

কাকা বলেন, দাদা, কি মনে হচ্ছে? ছেলেমানুষকে ধরে খবর সংগ্রহ হচ্ছে—কিনা?'

'না না তা' ঠিক নয়।' বাবা বললেন, 'অনেকদিন পরে এসেছে, জানতে ইচ্ছে হচ্ছে—'

'অনেকদিন পরে এসেছে। কিন্তু আসলে কে এসেছে সেটাই ভাববার! ফটোর সঙ্গে আমি তো কোন মিল দেখলাম না।'

এতো রাগ হয় আমার!

তেড়ে উঠে বলি, 'আর তোমারই বুঝি ছবির সেই ছিটের শার্ট পরা খোকা চেহারাটির সঙ্গে খুব মিল আছে?'

'বাঃ! চমৎকার! এই ঘণ্টা কয়েকেই তো বেশ তুক করে ফেলেছে দেখছি।'—কাকা কড়া গলায় বললেন, 'তোমার সার্কাস যাওয়া হবে না।'

আমিও রেগে বলি, 'আমি সার্কাস যাবই—'

'আমি বলছি যাবে না।'

আমি, যাবই যাব—'

'সিধু।'

কাকা বজ্র কণ্ঠে বলেন, 'গোল্লায় যেতে তো দেখছি পুরো একদিনও লাগছে না তোমার।'

'সার্কাসের কথা কি হচ্ছে সুবলদা?'

দরাজ গলায় প্রশ্ন করে ওঠেন সাবুমামা দালান থেকে।

কাকা থতমত খেয়ে বলেন, 'না মানে এত ইয়ে করে কত দূর থেকে এসেছ তুমি, টায়ার্ড রয়েছো, আর আজই 'সার্কাস' 'সার্কাস' করে পাগল করছে তোমায়, তাই বকছি—'

'বাঃ! ও আমায় পাগল করবে কেন? আমিই ওকে বলেছি। কি হবে বিকেল বেলা বাড়ি বসে থেকে? আসবার সময় দেখলাম হাওড়া ময়দানে বিরাট ছাউনি পড়েছে—'

'অমনি তোমার বুনো মন নেচে উঠল, কেমন? না না, আজ তুমি টায়ার্ড রয়েছো—'

সাবুমামার গায়ে একটা স্যাণ্ডো গেঞ্জি, আর পরনে ফর্সা পায়জামা, সাবুমামাকে দেখে মনে হচ্ছে 'টায়ার্ড' শব্দটা ওঁর ধারে কাছে উঁকিও দিতে পারে না। বললেনও তাই। হাতের মাস্‌লটা একটু ফুলিয়ে জোর গলায় বলে ওঠেন, 'টায়ার্ড? সাবিত্রীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য? নেভার! বুঝলে সুবলদা, ওই জিনিসটাকে ছায়া মাড়াতে দিই না। চলো ভাগ্নেসাহেব, চলো—বেরিয়ে পড়া যাক। সাজি-গুজি করে নাও।'

বলে বেরিয়ে যান দালানে।

কাকার মুখ রাগে লাল। বাবা অপ্রতিভ, আমি উত্তেজিত। ঠিক এই সময় সিঁড়িতে বড় মাসিমার টনটনে গলা বেজে উঠল, 'কই রে লতু, এসেছে নাকি?'

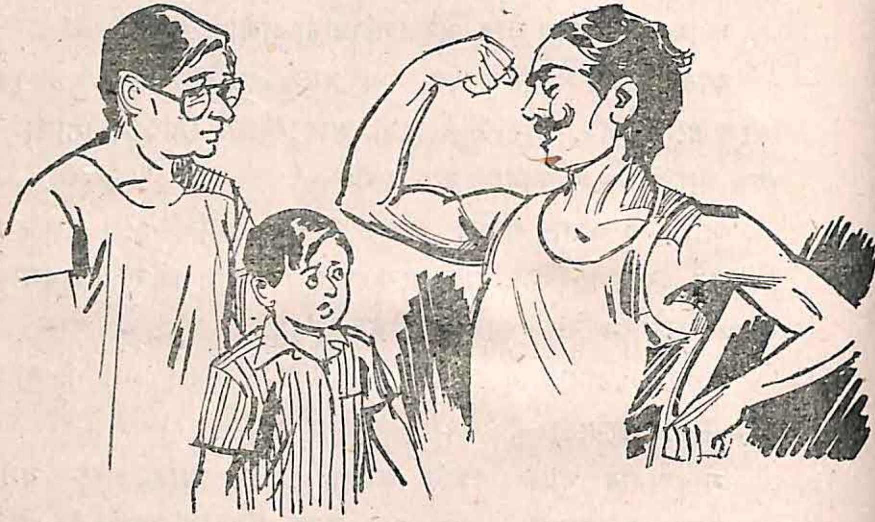
ব্যস্‌। হয়ে গেল। বুঝলাম, অভিযানে 'ইতি' পড়ল।

'কে বড়দি নাকি?'

সাবুমামা এগিয়ে এসে প্রণাম করে আমায় চোখে চোখে ইশারা করলেন, আজ আর হল না।

বেজার মুখে বসে রইলাম।

আশ্চর্য! বড়ো মাসির যেন আর আসার সময় ছিল না!



সারাদিন কি রাজকার্য করলে বাবা? মা তো সাবু সাবু করে কদিন ধরে কাবু হয়ে গেলেন, আর ইনি সারাদিনে আসবারই ফুরসৎ পেলেন না?

বড় মাসিমা দু' পা পিছিয়ে বলেন, 'এ কে?'

'ওমা ওই তো সাবু!' মা বলে ওঠেন, 'কি বড়োসড়ো হয়ে গেছে দেখছো?'

'তা দেখছি।" বড় মাসিমা ভারিক্কী গলায় বলেন।

সাবুমামা হেসে উঠে বলেন, 'চিনতে পারছ না তো?'

'তা' চেনবার মতো কিছু তো দেখছি না বাপু! আমি বলি, কে একটা পাঞ্জাবী না মহারাষ্ট্রী—'

সাবুমামার সেই আকাশ ফাটানো হাসি, 'নাঃ দেখছি বড্ডো

বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। তোমাদের মনের সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে না। খুব লম্বা চওড়া হয়ে গেছি তাই না?'

'ফর্সাও হয়েছো!' বড় মাসিমা বলেন।

'হুঁ বাবা! অনেক কাঠ খড় খরচ করতে হয়েছে ওই রংটির পেছনে'—সাবুমামা বলেন, 'নিয়মিত হস্তীদন্তচূর্ণ' গায়ে ঘসা, তার সঙ্গে মুক্তাভস্ম সেবন—'

বড় মাসিমা বেজার গলায় বলেন, 'বেটা ছেলের এতোর কি দরকার?'

'বাঃ! বিয়ে টিয়ে করতে হবে না? সাবুমামা হাসেন, 'কনের যদি পছন্দ না হয়!'

মা বলে ওঠেন, 'ধ্যেৎ!'

সাবুমামা নিজের গায়ে আদরের চাপড়া মেরে বলেন, 'আসল কথা নিজের এই শরীরটা ছাড়া আপন বলতে আর তো কিছু ছিল না। তাই ওকেই যত্ন আত্তি করেছি।'

মা যেমন আহ্লাদে অস্থির হচ্ছিলেন, মাসিমার কিন্তু তেমন ভাব নেই। মাসিমা ফট্ করে বলে বসেন, 'বরাবর বাইরে বাইরে ঘুরেছো, এতো ভাল বাংলা কথা শিখলে কোথা থেকে? ভুলে যাও নি?'

মাসিমা দেখছি 'তুমি' করেই বলছেন।

সাবুমামা ঈষৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেন, 'ভুলে যাবার ইচ্ছে হলে, বাংলা দেশে বসেও বাংলা ভাষা ভুলে যাওয়া যায় বড়দি। আর মনে রাখতে ইচ্ছে হলে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে গিয়েও মনে রাখা যায়। তাছাড়া—আমি যখন চলে গিছলাম তখন তো কথা চারটি শিখেছিলাম, না কি? আর সঙ্গে একটা বাঙালী বন্ধুও ছিল।'

'তা বটে!' বড় মাসি একটু লজ্জা পান বোধহয়। তাড়াতাড়ি বলেন, 'লোকে ভুলে যায়, তাই বলছি। আমার এক ভাগ্নে ক'বছর পাঞ্জাবে আছে, আসে যখন বাঙালী বলে বোঝাই যায় না। বলে ধুতি পরতে ভুলে গেছি। ছেলেমেয়ে দুটো এক অক্ষর বাংলা শেখেনি।'

'খুব ভাল !' বললেন সাবুমামা। তারপর বললেন, 'তুমি কিন্তু বড়দি ভীষণ বুড়ি বুড়ি হয়ে গেছো। অবিশ্যি তুমি চির বুড়িই ছিলে—'

বড় মাসি হঠাৎ রেগে যান।

বলেন, আমি কি ছিলাম না ছিলাম, এতকাল পরে মনে রেখেছো তুমি? বয়েস হলেই বুড়ো হয় লোকে।'

'কে বললে হয়? আমি হয়েছি? দেখে কত মনে হচ্ছে?'

বড় মাসি রেগে বলেন, দেখে তো তিরিশ-বত্রিশ মনে হচ্ছে। তাই বলে সত্যি তো আর—'

সাবুমামা কথা শেষ করতে দেন না, হা হা করে হেসে উঠে বলেন, 'হচ্ছে তো? গুড্। তোমার এই মন্তব্যের জন্যে রসগোল্লা খাইয়ে দেওয়া উচিত। ভাগ্নে যাও দশ টাকার রসগোল্লা নিয়ে এস, মাসিকে খাইয়ে দাও।' ফট্ করে একটা দশ টাকার নোট বার করে দেন পায়জামার পকেট থেকে।

মা বলেন, 'ঝকিস নে বাপু, দশ টাকার রসগোল্লা আবার কে খাবে এখন?'

'বড়দি খাবেন।'

বলে সাবুমামা হঠাৎ বড় মাসিকে পুতুলের মতো টপ করে তুলে এদিক থেকে ওদিকে বসিয়ে দেন।

'এ আবার কি আদিখ্যেতা!' বলে বড় মাসি হাঁফাতে থাকেন। সাবুমামা আমায় ইশারা করেন। আমি ছুটে গিয়ে দশ টাকার রাজভোগ নিয়ে আসি এবং খাওয়া-দাওয়াও হয় সবাই মিলে।

কিন্তু বড় মাসির যেন বেজার বেজার ভাব। 'এতোই যদি ইয়ে সাবু, তো একখানা চিঠি লিখেও তো খবর নিতে পারতে বাপু। আমরা না হয় তোমার ঠিকানা জানতাম না, তুমি তো আমাদের জানতে?'

এবার অপ্রতিভ হবার পালা মামার। মাথা চুলকে বলেন, 'তা সত্যি। তবে কি জানো, ওই কি রকম লজ্জা করত। লিখে লিখে জমা করতাম। পোস্ট করা আর হতো না।'

'লজ্জা তো তোমার শরীরে কিছু দেখছি না বাপু!' বলে বড় মাসি উঠে ও ঘরে যান।

'বড়দিটা চিরদিন এক রকম।' বলে হাসতে থাকেন সাবুমামা। তারপর বলেন, 'চলো ভাগ্নে, সার্কাস যখন দেখাই হল না, তোমাদের পাড়াটাই একটু দেখে আসি।

বেরিয়ে পড়ি নিশ্চিন্ত মনে, বাড়িতে যে ইতিমধ্যে রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স বসে যাবে তা কে জানে!

আমরা যখন ফিরলাম তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সাবুমামা গাদা-গুচ্ছের চকোলেট টফি খেলনা বল ইত্যাদি কিনে দু'হাত বোঝাই করেছেন, আমার হাতেও বেশ কিছু। সেই সব নিয়ে বাড়ি ঢুকছি, দেখি দরজায় বড় মেসো।

আমায় দেখে বলে ওঠেন, 'এই যে তুমি ফিরছ? তবু ভালো।'

আমি অবাক হয়ে বলি, 'ফিরবো না মানে?'

'তা কি জানি! বাড়িতে তো হুলিয়া পড়ে গেছে।'

'তার মানে?' আমি জিনিসগুলো নামাতে ছুটি।

পিছনে শুনতে পাই, 'আরে বড়ো জামাইবাবু না? ভাগ্নে, আমার হাতের জিনিসগুলো নিয়ে যাও, গুরুজনকে প্রণাম করতে পারছি না।'

এই সরল এই সুন্দর এই সহজ মানুষ, তাঁর বিরুদ্ধে কি করেই যে সন্দেহ ওঠে!

ভিতরে ঢুকে দেখি বড় মাসি উত্তেজিত হয়ে বলছেন, 'সব্‌বাইকে চিনতে পারাই তো সন্দেহের। এতোদিন পরে এসে অমনি সবাইকে চিনতে পারছে? ছেলের হাতে মোয়া নাকি? আশপাশ থেকে অনেকদিন থেকে সন্ধান রাখছে। আমি বলছি, কক্ষনো ও সাবু নয়। জাল লোক। তুই অমনি আহ্লাদে গলে গিয়ে একেবারে দোতলায় তুলে এনে ঠাঁই দিলি। এসেই একেবারে হাজার, দু-হাজার টাকার জিনিস ছড়াচ্ছে, এর মানে কি?'

মা অবশ্য জোর প্রতিবাদ করছেন। 'মানে তুমিই বল! আমাদের কি এতো আছে যে জাল লোক আমাদের বাড়িতে আসবে? রাজত্ব আছে নাকি?'

'কি আছে তা তুমি আমি কি বুঝব?' তবে আমি বলছি ও সাবু নয়।'

'নয় তো এত কথা জানলো কি করে?'

'সব সন্ধান নিয়েছে। যারা এসব জাল-জোচ্চুরি করে তারা অনেক জাল ফেলে। এখন ছেলেটাকে নিয়ে কোথায় সট্‌কালো দেখো—'

'ওই তো ছেলে—' মা চেঁচিয়ে ওঠেন, 'কোথায় গিয়েছিলি?'

'বাঃ, কোথায় আবার? সাবুমামার সঙ্গে এই সব দোকানে টোকানে!'

'আবার কি দোকানে?'

'এই তো বল, পুতুল, টফি—'

'ওই গ্যাখো'—বড় মাসি বেজার গলায় বলেন, 'এসেই একেবারে দশ হাতে পয়সা ছড়িয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। এটি ভাল লক্ষণ নয়।

মার বোধহয় আমাকে দেখে মনের জোর ফিরে আসে। তাই বলেন, 'দিদি যে কি বলিস? দেখছি একেবারে সেই রকম। সেই সব পুরনো কথা বলছে।'

বড় মাসিমা বলে ওঠেন, 'সাবু অত বাচাল ছিল নাকি? এ যেন বেয়াড়া বাচাল—'

'আহা, বয়েস হয়েছে তো! তাছাড়া ছেলেবেলাতেও সাবু কম কথাত্তে ছিল না।'

খুব রাগ হয় আমার। বলে উঠি, 'উনি যে সাবুমামা নয়, এই কথাটা প্রমাণ করতে এতো উঠে পড়ে লেগেছেন কেন বলুন তো বড় মাসিমা? উনি আপনার কি ক্ষতি করেছেন?'

'ওমা! ছেলের ট্যাকটেকে কথা শোন—' বড় মাসি বলেন, 'তোমাদের ক্ষতি করবে সেই চিন্তাই করছি বাছা! লতু ওর চিহ্নগুলো

মিলিয়ে নিয়েছিলি ?'

মা চমকে উঠে বলেন, 'চিহ্ন, কি চিহ্ন ?'

'আহা, ওর সেই একটা মস্ত চিহ্ন ছিল না? যে কথা হল সেদিন। বাঁ কানের পাশে জড়ুল আর ডান পায়ে ছটা আঙ্গুল। ওইখানেই তো আসল প্রমাণ।'

মা শুকনো মুখে স্বীকার করেন, সেটা দেখা হয়নি বটে! কারুরই মনে পড়েনি।

'তবেই তো—বলছি না। এসেই কথায় আর জিনিসে তোদের তুক্ করে ফেলেছে। আসা মাত্রই তো ওটা দেখবি। চেহারায় যখন কিছু বোঝা যাচ্ছে না।'

'মুখটা তো বোঝা যাচ্ছে।' মা আস্তে বলেন।

বড় মাসিমা বলেন, 'ছাই বোঝা যাচ্ছে! চোখে ইয়া বড় এক-জোড়া চশমা। নাকে ইয়া এক জোড়া গোঁফ! অত গোঁফ কেন?'

মা চুপ করে থাকেন।

আর কি বলবার আছে?

সাবুমামা তখন বড় মেসোর সঙ্গে জমিয়ে বসেছেন। নানা দেশ বিদেশের গল্প হচ্ছে। আমি মলিন মুখে গিয়ে বসি।

ভাবছি বড় মাসি আরও কি বলে বসবেন, সাবুমামা হয়ত আহত হবেন!

তা হলোই সেই কাণ্ড!

ওঁরা যেই বাড়ির মধ্যে এসেছেন, বড় মাসি বলে ওঠেন, 'সাবু, তোমার পৈতে দেখছি না কেন?'

'পৈতে!'

সাবুমামা প্রায় আকাশ থেকে পড়েন, 'সেটা আবার কোন্ স্বর্গীয় বস্তু?'

'কি আশ্চর্য! পৈতে জানো না? পৈতে হয়নি তোমার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হয়েছিল বটে কোন তামাদিকালে। পিসিমা ধরে ন্যাড়াট্যাড়া করিয়ে দিয়েছিল। সে কি আর এখনো বুকে ধরে বসে আছি?'

'থাকা উচিত। বামুনের ছেলে যখন।'

মা আর থাকতে পারেন না; বলে ওঠেন, 'দিদি যে কি বলিস! এদের তো পৈতে অর্ধেক সময় ধোবার বাড়ি চলে যায়।'

বড় মাসিমা মার দিকে একবার ভস্মদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেন, 'সেটা কিছু বাহাদুরি নয়। তা সাবু, তুমি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার পর কাগজে কত বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, তোমার চোখে পড়েনি?'

'হয়েছিল না কি?' সাবুমামা বলেন, তা' কি জানি ছাই। তাছাড়া তখন কোথায় আমরা, আর কোথায় কাগজ! কি লেখা হয়েছিল? 'সাবু ফিরিয়া আইস! পিসিমা মৃত্যুশয্যায়—' বলে আবার সেই ঘর ফাটানো হাসি হাসেন সাবুমামা। সে হাসিতে যেন সব ধুলোময়লা উড়ে চলে যায়। কিন্তু সংসারী লোকরা বড়ই কঠিন, তাই বড় মাসিমা তেমনি খনখনে গলায় বলেন, 'তা কেন! লেখা হয়েছিল—'নিরুদ্দেশ—নাম সাবিত্রীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য। বয়েস ষোল, রং ফর্সা রোগা লম্বা, বাঁ কানের পাশে কালো জড়ুল, ডান পায়ে ছটি আঙুল। যদি কেহ সন্ধান দিতে পারেন।'

হঠাৎ দেখি সাবুমামার মুখটা যেন একটু নিভে গেল।

কেমন অপ্রতিভ গলায় বলে ফেললেন, 'জড়ুল ফড়ুল জানি না, তবে ছটা আঙুল আর নেই।'

'নেই মানে?'

বাবা, কাকা, বড় মাসি, বড় মেসো একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'আঙুল যাবে কোথায়?'

সাবুমামা একটু হেসে বলেন, সেটাকে অপারেশন করে উড়িয়ে দিয়েছি।'

'পায়ের কড়ে আঙুলের পাশে এইটুকুন একটু আঙুল, সেটা

আবার তুমি অপারেশন করতে গেলে কি জন্যে ?'

এঁদের গলা থমথমে।

সাবুমামা বলেন, 'দেখতে বিশ্রী লাগত তাই—'

মার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, মার মুখটা একেবারে নিভে গেছে। যেন মা আশা করেছিলেন এক্ষুনি সাবুমামা ওঁর কুমীরের চামড়ার চাপা চটিটা থেকে পা বার করবেন, আর সবাই দেখবে হ্যা ছটা আঙুলই তো বটে।

কিন্তু কেমন যেন ছায়া পড়ে গেল পরিস্থিতিটায়। তার ওপর আবার সাবুমামা বেগুন ভাজা দিয়ে লুচি খেলেন।

এটি বড় মাসিমার কৌশল।

তখন বলছিলেন, 'মানুষ চেনা যায় খাওয়ায়। আর নজর জানা যায় খাওয়ানোয়। ছাখ না বেগুন ভাজা খায় কিনা!'

মা আস্তে বললেন, 'তুই বেগুন ভাজা খেলি ?'

'কেন ? কি হয় ?'

'আগে তো খেতিস না। মনে নেই সেই বলতিস্—'

'কি বলতাম ?'

'তুই-ই বল্।'

'কি জানি বাবা, মনে তো নেই। আর আগে কি খেতাম না খেতাম তাই কি মনে আছে ? এখন তো সর্বভুক্। যা পাই তাই খাই।'

সবাই একটু চোখাচোখি করলেন দেখলাম।

কানের সেই জড়ুলের দাগের কথাটা আর তুললেন না কেউ। ভুলেই গেলেন, না গ্রাহ্য করলেন না কে জানে!

তারপর যখন খাওয়া হয়ে গেছে, কাকা হঠাৎ বললেন, 'কি রকম অপারেশন করেছ দেখি ? দাগটাগ কিছু নেই ?'

'নাঃ, দাগ থাকবে কেন ? হংকঙের এক বড় ডাক্তার করে দিয়েছিল।'

পা-টা দেখালেন না।

চলে গেলেন আঁচাতে। একটু যেন গম্ভীর।

বড় মাসিমা চাপা গলায় বললেন, 'ভয় খেয়েছে।'

বলাই বাহুল্য রাত্রে আর আমার ভাগ্যে সাবুমামার কাছে শোওয়া হল না। মা একটা বাজে ছুতো করলেন। বললেন, 'ওই সরু খাটে দু'জনে কি করে শুবি? কাল একটা চৌকি দেব।'

অথচ খাটটা মোটেই সরু নয়।

সাবুমামা বললেনও, 'যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় ন'জন। আমরা মামা-ভাগ্নে কি সুজন নই? দুর্জন?'

তবু কথাটা দাঁড়াল না।

সাবুমামা একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে শুয়ে পড়লেন।

আমার দুঃখও হল যত, লজ্জাও করল ততো।

বড় মাসিমার ওপর রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল।

দু' ঘণ্টার জন্যে এসে মাকে বদলে দিয়ে গেলেন।

মা যে কি চুপচাপ হয়ে গেলেন!

তারপর সকালে হল সেই কাণ্ড।

সকালবেলা সাবুমামা অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা লতুদি, রাত্রে আমার ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছিল কে? বন্ধ ছিল দরজাটা।'

মার সেই ছটা আঙুলের পর থেকে তো সেই উৎফুল্ল ভাব আর নেই। তবু চেষ্টা করে বলেন, 'ওমা সে কি! বন্ধ থাকতে যাবে কেন?'

'কেন তাই তো জিজ্ঞেস করছি। কিন্তু বন্ধ ছিল।'

'ধ্যেৎ! তা হলে তুই বেরোলি কি করে?'

'সে তো এখন। খুব ভোরে ঘর থেকে বেরোতে পারিনি।'

মা গম্ভীরভাবে বলেন, 'তা তোর তো এ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথ, বেরোবার কি দরকার হচ্ছিল?'

'এমনি। আমি খুব ভোরে উঠে ব্যায়াম করি কিনা, ভাবলাম, ছাদে চলে যাই। তা দেখলাম বাইরে থেকে আটকান।'

বাবা বলে ওঠেন, 'ওটা তোমার মনের ভ্রম। আটকানো থাকবে কেন ? বোধহয় বেশী চেপে গিয়েছিল।'

সাবুমামা সেই আকাশ ফাটানো নয় শুধু একটু হেসে বললেন, 'কতো বেশী ? যাতে সাবিত্রীপ্রসন্ন হেরে যেতে পারে ? হাতের মাস্‌লে লোহার শেকল বেঁধে মাস্‌ল ফুলিয়ে ছিঁড়ে দিতে পারি বুঝলেন ?'

বাবা গম্ভীরভাবে বলেন, 'সব বিষয়েই তাজ্জব করে দিচ্ছো তুমি। আগে তো ছিলে একটি পেটরোগা পেটরোগা পটকা।'

'সেই থেকেই তো গোঁ হয়েছিল শরীরচর্চা করবার।'

বাবা বললেন, 'চর্চাটা একটু বেশীই করে ফেলেছো মনে হচ্ছে।'

সাবুমামা আর উত্তর দেবার অবকাশ দিলেন না, ও ঘরে চলে গেলেন।

মাও ফট্ করে রান্না ঘরে চলে গেলেন। আমিই দাঁড়িয়ে রইলাম বোকার মতো। সার্কাস দেখার কথাটা আর লজ্জায় তুলতেই পারলাম না। যদি বাড়ির লোকেরা আজও যেতে না দেয় ?

একটুক্ষণ অপেক্ষা করলাম, সাবুমামা নিজে থেকে যদি কিছু বলেন, কিন্তু বললেন না কিছু।

ঘরের মধ্যে বসে জিনিসপত্র নিয়ে কি যেন নাড়া-চাড়া করতে লাগলেন।

আমি আর কি করবো!

নীরবে নেয়ে খেয়ে ইস্কুল চলে গেলাম। বেশ বুঝতে পারলাম সেই ছাত ফাটানো হাসিটা আজ আর হচ্ছে না মার সঙ্গে।

মা যেন কেমন 'চোর চোর' হয়ে গেছেন।

তবে কি সত্যিই রাত্রে সাবুমামার ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ? ভেবে সারা শরীরটাই যেন চিন্‌চিন্

করে এলো।

. স্কুল শেষ হলো। ঘণ্টা পড়া মাত্রই বাইরে বেরিয়ে এসেছি। হট্টগোলের মধ্যে, হঠাৎ দেখি গেটের বাইরে ওপাশে একটা গাছের নিচে সাবুমামা দাঁড়িয়ে, হাতে একটা মাঝারি সাইজের সুটকেস।

আমার বুকটা ধড়াস্ করে উঠলো।

এ কি ! চলে যাচ্ছেন নাকি কোথাও ?

তাড়াতাড়ি কাছে এসে বললাম, 'সাবুমামা, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?'

'কোথায় ?' সাবুমামা অদ্ভুত একটু হেসে বললেন, 'পৃথিবীর কোনো একখানে।'

আমার মনে হলো রাস্তার ধুলোতেই বসে পড়ি।

কাঁদো কাঁদো হয়ে গেলাম। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'তার মানে ? আপ'নি চলে যাবেন ?'

'কি আর করা যাবে ?' সাবুমামা হাসেন, 'এ কপালে সুখ সইবার নয়, বুঝলি ? ভেবেছিলাম এতোদ্দিনে এইবার একটু স্থিতু হয়ে বসবো। হলো না, ভাগ্যে নেই।'

'কে বলেছে ভাগ্যে নেই ?' আমি আবারও না চেঁচিয়ে পারি না, আমিই বলছি—'

সাবুমামা গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, 'ভাগ্য তো জন্মকালেই ঠিক হয়ে যায়। ছেলেবেলায় যার মা মরে, তার মতো অভাগা আর কে আছে বল্ ? আমার যদি মা বেঁচে থাকতো তাহলে কি আর ছোট্ট একটা কড়ে আঙুলের জন্যে আস্ত ছেলেটাকে ফেলে দিতো ?'

আমার গলা বুজে আসছিলো, তবু কষ্টে বললাম, 'বাঃ, ফেলে দেওয়া কি আবার ?

সাবুমামা মাথার ওপরকার গাছের পাতাগুলোর কাঁপনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বলে উঠলাম, 'সাবুমামা, আপনি কিছুতেই যেতে পাবেন না।'

সাবুমামা হঠাৎ মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে বললেন, 'তুই বললেই তো আর হবে না রে! আমাকে কেউ বিশ্বাস করলো না বুঝলি? ভাবতে পারিস তোকে প্রমাণ করতে বসতে হবে—তুমি সিধু!...কি বিশ্রী! আমার মনটা দেখলো না কেউ, কেউ আমার ভালোবাসাটা দেখলো না, দেখতে চাইলো শুধু আমার তুচ্ছ একটা চিহ্ন।...যে চিহ্নটা কোনোদিন কোনো কাজে লাগবে এমন কথা ভাবতে পারিনি বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম।'

আমি প্রায় কেঁদেই ফেলি, 'কেন যে দিয়েছিলেন মামা! ওইটা থাকলে তো আর কেউ—'

'কি করে জানবো বল?'

সাবুমামা আবার সেইরকম করে হাসেন, 'ভাবতেই পারিনি এই এতো বড়ো আস্ত মানুষটা কোনো কাজে লাগবে না, কাজে লাগবে সিকি ইঞ্চি সেই বাড়তি আঙুলটা! সেটাই হবে আমার একমাত্র পরিচয়-পত্র। তা ভাবলে হয়তো সেটাকে যত্ন করে পুষে রাখতাম।'

আমার হঠাৎ সেই আর একটা চিহ্নের কথা মনে পড়ে গেল। বলে উঠলাম, 'আপনার তো আরো একটা চিহ্ন আছে সাবুমামা—সেই কানের পিঠে জড়ুল না কি? সেটা নিশ্চয়ই আছে।'

'থাকতে পারে! আছেই হয়তো!'

'তবে?'

আমি সাবুমামার একটা হাত চেপে ধরি, 'তবে আর কি? চলুন না একবার দেখিয়ে দেবেন সবাইকে—'

দূর!' সাবুমামা ক্ষুব্ধহাসি হাসেন, দূর! ভালোবাসা দিয়েই যদি বিশ্বাস করাতে না পারলাম, বাজে একটা দাগ দেখিয়ে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করাতে যাবো? তোর কাকা হয়তো বলে বসবে, দাগটা নকল। রং মাখিয়ে তৈরী করা হয়েছে। কি বিশ্রী! কি বিশ্রী! তোকে একটু দেখতে ইচ্ছে হলো তাই এতোক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম।'

আমার কাঁধটা একটু ঠুকে দিলেন।

'সাবুমামা, আমি আপনার সঙ্গে চলে যাবো'—হাতটা চেপে ধরে বলে ফেললাম। বানিয়ে নয়, সত্যিই মনে হলো চলে যাই।

সাবুমামা হঠাৎ নিজের ধরনে হেসে উঠলেন, 'চমৎকার! তাহলে তো পাকা আসামীই বানিয়ে দিবি আমায়। সবাই বলবে, দেখছো, যা ভেবেছি তাই। জোচ্চোর! ছেলে চুরি করতে এসেছিল।··· দেখলি না আমার সঙ্গে সার্কাস দেখতে যেতে দিলো না, আমার কাছে রাত্রে শুতে দিলো না—'

'সাবুমামা, আপনার জিনিসপত্তর?'

'জিনিসপত্তর? আমার আর কি? সবই তো তোদের জন্যে এনেছিলাম। আমার দুটো জামাটামা এই যে নিয়েছি।'

'মা খুব কাঁদবেন সাবুমামা!'

সাবুমামা চোখের চশমাটা খুলে মুছতে মুছতে বললেন, 'তা জানি। লতুদি আমায় বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু ওরা সেটা রাখতে দিলো না। তোকে কাল বলেছিলাম মনে আছে, মানুষের মতো হিংস্র প্রাণী আর কেউ নেই। দেখলি তো?'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করেছি, সাবুমামা—

সাবুমামা আবার চশমাটা খুলে মুছতে মুছতে বললেন, 'জানি রে! সেইজন্যেই তো তোকে দেখবার জন্যে···এই ট্যাক্সী—'

হাত তুলে একটা খালি ট্যাক্সীকে দাঁড় করিয়ে তার মধ্যে উঠে পড়লেন সাবুমামা।

জানলা দিয়ে হাত নেড়ে 'টা টা' করলেন। গাড়িটা সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

আর হঠাৎ মনে হলো এইমাত্র আমার কোনো খুব আপনার লোক মরে গেল!

নিখরচায় আমোদ

'নাঃ বাপু, আমোদ-আহ্লাদ কাকে বলে, তা' এ যুগের তোরা জানিসই না।'

বড়কাকা ধিক্কারের গলায় বলেন, এ কথা আমি বলবোই তোদের কোনটাই হচ্ছে নি সেধো।'

বড়কাকার ভাইপো বাড়ির কর্তা সুশীলবাবু বলে ওঠেন, 'হঠাৎ এ কথা যে বড়কাকা?'

সুশীলবাবুর বয়েস পঞ্চাশের কাছে প্রায়, কিন্তু কাকা-টাকার কাছে তিনি বালকভাবেই থাকেন। বড়কাকাও সেই নজরেই দেখেন। তাই আরো ধিক্কারের গলায় বলেন, 'না তো কী? রিটায়ার করে পর্যন্ত কমগুলো বাড়ি তো দেখলাম না। প্রায় সবক'টা ভাইপো ভাইঝি ভাগ্নে ভাগ্নীর বাড়ীতেই ঢুঁ মারা হয়ে গেল, সর্বত্রই একই অবস্থা। মানুষ তো না, যেন সব কাজের যন্তর, সংসার করা না দিনগত পাপক্ষয়। সবাই কাজের পেছনে ছুটছে, মেয়েগুলোর পর্যন্ত শান্তি নেই।...রান্নাঘরে এক ব্যাটা চাকর পাজামা পরে হাঁড়ি ঘটঘটাচ্ছে, সুক্ত মোচার নামও জানে না বোধহয়।'

সুক্ত মোচার ঘণ্টর বিরহেই বোধহয় বড়কাকা আরো উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন, 'অথচ এই তোদের বড়কাকা? রাজপুতানার মরুভূমিতে পর্যন্ত মোচার ঘণ্ট সুক্তুনি খেয়েছে। কাজের ধান্দায় কম দেশ তো ঘুরতে হয়নি। আর বেশীর ভাগই সব পাণ্ডববর্জিত দেশে।'

কথাটা মিথ্যে নয়, বড়কাকা সরকারী ওভারসিয়ারের কাজে ভারত প্রদক্ষিণ করেছেন বললেই হয়। যখনি যেখানে বন কেটে নগর বসানোর আয়োজন হয়েছে, তখনি বড়কাকার তলব পড়েছে। একে তো বড়কাকা কর্মদক্ষ, তাছাড়া বড়কাকা যে কোনো জায়গায় যেতে

প্রস্তুত ছিলেন। কারণ সুশীল বাবুদের ভাগ্যে বড়কাকীর আবির্ভাব আর ঘটেনি বাড়িতে।

অতএব বড় কাকা চিরদিনই মুক্তপুরুষ। এলো ডাক্ তো তোলো তল্পী!

অথচ বড়কাকা সর্বত্রই মোচার ঘন্ট স্থক্ত খেয়ে ছেড়েছেন।

তা'বলে ভাববার হেতু নেই বড়কাকা নিরামিষাশী বৈষ্ণব, ওই মোচার ঘন্টই সার তাঁর। আমিষ নিরামিষ দু'দিকেই তাঁর সমান দৃষ্টি, সমান আকর্ষণ! অর্থাৎ ভদ্রলোক যাকে বলে—ভোজনবিলাসী। যেখানেই গিয়েছেন, বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে ফেলেছেন, খাওয়া-দাওয়ার বান ডাকিয়েছেন। 'বিপিনবাবু' বলতে অজ্ঞান হয়েছে সবাই।

কিন্তু কোথা দিয়ে কখন যে সেই সোনার দিনগুলো কেটে গেল! মানুষটা তাজা চকচকে থাকতে থাকতে ছুম্ করে কিনা রিটায়ার করিয়ে দিল।

এখন অসুবিধে এই, সারাজীবন কাজই করেছেন, বিয়ে-টিয়ে করার ফুরসৎ পাননি, কাজেই এখন বুড়ো বয়সে ভর করবার জন্যে কোনো বৃক্ষশাখা নেই।

আগে ছুটি-টুটিতে যখন দেশে আসতেন, বাড়িতে মা ছিলেন, পিসি ছিলেন, বড়বৌদি ছিলেন, অতএব বড়কাকা গোপাল ঠাকুরের আদরে ছুটি কাটিয়ে গেছেন। বড়কাকাও এসে যে যেখানে আছে সকলের সঙ্গে দেখা করেছেন, সকলকে উপহার-টুপহার দিয়েছেন, সম্পর্ক-সূত্রটা দৃঢ় থেকেছে।

কালক্রমে মা, পিসি পটল তুললেও বড়বৌদি, অর্থাৎ সুশীলবাবুর মা অনেকদিন ছিলেন। তা তিনিও সম্প্রতি দেহরক্ষা করেছেন।

রিটায়ার করে দেশে ফিরে এসে বড়কাকা দেখছেন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই সংসারগুলোর চেহারাই সব পাল্টে গেছে, অন্য এক ছাঁচে ঢালাই হয়ে গিয়েছে যেন! ···এ ছাঁচের সঙ্গে বড়কাকার মনের ছাঁচ মেলে না।

সারাজীবন ধরে বড়কাকা 'রিটায়ারের পরের' যে ছবিটি দেখেছেন সে ছবির নামগন্ধও নেই কোথাও।

আরে বাবা, কাজ তো তিনিও করেছেন আজীবন, তাঁর নামই ছিল 'কাজ পাগলা বিপিনবাবু'। কিন্তু তাই বলে কি তাস খেলেন নি? দাবা খেলেন নি? আড্ডা দেন নি? পিক্‌নিক করতে যান নি দলবল জুটিয়ে?

সবই করেছেন।

কলকাতায় যখন এসেছেন, তখনও চুটিয়ে সবই করেছেন। কিন্তু এখনকার এরা? নাঃ, কিছুর সময় নেই এদের। খেতে বসে ভাইয়ে ভাইয়ে, কি বাপে ছেলেয়, দুটো গল্প করবার সময় নেই।

দেখে প্রাণ হাঁপিয়ে আসে।

প্রাণপাত করে রোজগার তবে করবে কেন মানুষ? যদি উপভোগই না করবে?

একটা বাড়ি খারাপ লাগলে অন্য একটা বাড়িতে চলে যান বড়কাকা, এবং এইরকম চলতে চলতে অথবা চরতে চরতে, প্রায় সব বাড়িই ফিনিস করে এনেছেন, কিন্তু কোথাও মন বসছে না।

আরো দুঃখের কথা, 'চলে যাবো' বললে কেউ বাধাও দেয় না। ভাবটা যেন 'তা তো যাবেই। সত্যি তো আর চিরকাল থাকতে আসো নি!'

অথচ বড়কাকারা?

মনে আছে যখন ছোট ছিলেন তিনি দেখেছেন তো!

মামা কি কাকা, পিসে কি মেসো বাড়িতে কেউ এলে তাকে আরও দু'দিন ধরে রাখার জন্যে সকলের কী আকুলি বিকুলি!

বাড়ির ছোট ছেলেদের ওপর ভার দেওয়া হতো অতিথির জুতো ছাতা, ব্যাগ, ঘড়ি লুকিয়ে ফেলে তাকে আটকে ফেলা!

আশ্চর্য! সেই মনগুলো গেল কোথায়?

সেই বাড়ি-ঘর সেই দেওয়াল ছাদ মেজে, দরজা জানলা পর্যন্ত যথাযথই রয়েছে। অথচ মানুষগুলো যেন অন্য জগতের!

অবশ্য সুশীলবাবু পুরনো কালের সামান্য স্মৃতি বহন করছেন, 'বড়কাকা কেমন আছো ? বলে কাছে বসেনও একটুক্ষণ। কিন্তু ব্যস ওইটুকুই। একটু পরেই হাই তুলে বলা, 'যাই অফিসের ক'টা ফাইল এনে রেখেছি—'

আজ তাই বড়কাকা রেগে-টেগেই বলে বসেছেন, 'বলি কাজ আর কে না করে ? আমরা করি নি ? তা বলে আমোদ-আহ্লাদ থাকবে না ? শুধু কাজ থাকবে ? এ যুগের এই দেখছি—'

আবেগের মাথায় বড়কাকা আজ সুক্ত মোচার ঘন্টর বিরহও জানিয়ে বসেন।

সুশীলবাবুর মেজ মেয়ে বলে উঠে, 'তা আপনারও তো ওই একটা চাকরই ছিল রান্নাঘরের গিন্নী, সত্যি গিন্নীর বালাই-টালাই তো ছিল না, আপনি তবে মোচার ঘন্ট খেতেন কি করে শুনি ?'

বিপিনবাবু মহোৎসাহে সোজা হয়ে উঠে বসে বলেন, 'গিন্নীর বালাই ছিল না বলে, আমার অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি ছিল নাকি রে ? বলি গিন্নীর কী ধার ধারি ? নিজের হাত নেই ? সেই হাতে নেই পাঁচটা-পাঁচটা দশটা আঙ্গুল ? কোন্‌টা না রাঁধতে জানি ? চাকর ছিল, চাকরের রান্নার তোয়াক্কা করেছি কোনোদিন ? নিজেই রেঁধেছি। সে ব্যাটা কেবল যোগাড় করে দিয়েছে, ফার্স্ট ক্লাস রান্না রেঁধেছি।'

নাতনী হি-হি করে হেসে উঠে বলে, 'সে তো আপনি বলবেনই। আমাদের দিদিমা বলেন, রান্নার সুখ্যাতি কার আছে ? না রাঁধুনীর আপন জিভের কাছে। আর কে কে নিন্দের কথা বলে না ? না ঠাকুর আর কুকুর। তা আপনার তো ঠাকুর-কুকুরের প্রশ্নও ছিল না, শুধু নিজের জিভ।'

মেয়েটার সবে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেছে, আর গানের নাচের সেলাইয়ের ইস্কুলগুলোও বড়দিন উপলক্ষে বন্ধ। তাই একটু ফ্রী আছে, মুড্‌ও আছে দাদুকে ডেকে গল্প করার। আর বুড়ো ক্ষ্যাপানোয় একটু মজা তো আছেই। বড়কাকা অবশ্য এ অভিযোগে

তেড়ে ওঠেন।

বড়কাকা বলেন, 'শুধু নিজের জিভ? আমরা অমন তোদের এযুগের মতো কেবল নিজেরটি নিয়ে থাকতাম না। একা থেকেছি, কিন্তু বলুক দিকি কেউ যে কোনোদিন শুধু একজনের মতো রেঁধেছি? দু'জন চারজন থাকতোই সঙ্গে। তাছাড়া বড় বড় ফীস্ট হয়েছে, মাংস রেঁধেছে এই শর্মা। রান্নায় তোদের দাদু হারে না।'

বলেই বড় কাকা হঠাৎ হা-হা করে হেসে উঠে বলেন, 'তবে হ্যাঁ, একবার হয়েছিল এক মজা। তখন রাঁচিতে কাজ চলছে, অফিসের জন-দশেক লোক, একটা মেস মতো করে থাকি, তাদের কারো ফ্যামিলি আসেনি সঙ্গে। তা এই বিপিন বাঁড়ুয্যের হাতের রান্না খেয়ে গৃহ পরিবারের অভাব ভুলেছিল। সেই সময় একবার সেই হাতের উপর একটা ভারী লোহা পড়ে গিয়ে এমন জখম যে, সাতদিন হাত নাড়তে পারি না। অতএব মহাপ্রভুর হাতে খাওয়া চলছে, আর ক্রমশঃ রসনা বিদ্রোহ করছে। বাকি ন'জনও তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, ও বিপিনদা অভ্যাসটা এতো বদ করে দিলেন কেন? এ যে গলা দিয়ে নামে।

হঠাৎ একদিন সকালে উঠে কোন কথাবার্তা নয়, দাড়ি কামাতে কামাতে হাঁক পাড়লাম, 'রামহরি, শীগগির আমাদের থালা গেলাস আর আসনগুলো নিয়ে চ্যাটার্জি বাবুর বাড়ি পৌছে দিয়ে আয় দিকি।' শুনে ছোঁড়া তো হাঁ। বলে, 'কি কইছেন বাবু?'

আমি বলি, 'বলছি তোমার মাথা আর মুণ্ডু। এ বাড়ির দশটা থালা, দশটা গেলাস আর দশটা আসন চ্যাটার্জী বাবুর বাড়ি নিয়ে বলবি, 'বাবু পাঠিয়ে দিলেন, ঢুকেছে মাথায়?'

রামহরি মাথা নাড়ে। অর্থাৎ ঢোকেনি।

আমি বলি, 'থাক্ বাবা আর ঢোকাতে হবে না। যা বলছি কর।'

রামহরি তবু অনড়,'তবে এ বাড়ির খাওয়া-দাওয়া কিসে হবে বাবু?'

বলে উঠি, লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর, এ বাড়িতে আজ খাওয়া-দাওয়া হবে

না। বুঝলি?'

বড়কাকার নাতনী বলে ওঠে, 'ওকি দাদু! খামোকা চাকরটাকে গাল দিলেন যে?'



'গাল? আরে বাবা গাল নয়, ওই আমার সম্ভাষণ ছিল।'

'বলেন কি দাদু? রাগ করতো না? তেজ করে চলে যেতো না?'

'পাগল!' দাদু একটু অমায়িক হাসি হাসেন। 'জানে তো এটা হচ্ছে বাবুর সখের রাগ। এ কি তোদের এ কালের মতো ফুলপ্যান্ট পরা চাকর?'

'কি জানি বাবা!'

নাতনী দু'হাত উল্টোয়, 'কেমন সব ভূত ভূত লোক ছিল।'

'ভূত ভূত!' বড়কাকা রেগে বলেন, 'আর তোদের এখনকার সব লোকজন স্রেফ্ ভগবান ভগবান, কেমন? ইয়ারের রাজা, বেয়াড়ার অবতার, তোদের ওইসব লোক দেখলে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে যায়।

বড়কাকা একটু দম নিয়ে বলেন, 'তুই বলছিস রাগ করলো? হুঁঃ! বরং আহ্লাদে দন্ত বিকশিত করে বললো, 'আজ তাহলে আর রাঁধতে হবে না বাবু?'

বললাম, 'না। আরও একদিন তোমার হাতের রান্না খেতে হলে রাঁচি ছেড়ে আর চলে যেতে হবে না। এইখানেই কাঁকের হাসপাতালে ভর্তি হয়ে থেকে যেতে হবে।'

'কেন বাবু, হাসপাতাল কেন?' রামহরি চোখ কপালে তোলে।

চেঁচিয়ে বলি, 'হতভাগা তুমি দূর হও। যা বলেছি করবি কি না?

'করবো না? বাবু কী বল!'

বলে পরমানন্দে সে সেই দশের বোঝা নিয়ে হন্‌হনিয়ে হেঁটে খানিক দূরে চ্যাটার্জির বাড়ি চলে যায়।

ব্যাপারটা তো কেউ জানে না! আশুবাবু নামের একজন বুঝি স্নানের ঘরের জানলা থেকে দেখতে পেয়েছে ঘটনাটা, ব্যাস্ তার মাথা ঘুরে গেছে। বাথরুম থেকে যে অবস্থায় না বেরোবার কথা, সেই অবস্থায় বেরিয়ে পড়ি-তো-মরি করে ছুটে এসে চীৎকার করে উঠেছে, 'বিপিনদা, সর্বনাশ হয়েছে।'

আমিও অবশ্য বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা, বলে উঠি, 'কী হলো?'

আশুবাবু গামছাটার কোণ দুটো ভুঁড়ির ওপর মুঠো করে চেপে



ধরে মুখের জল ঝাড়তে ঝাড়তে বলে, 'রামহরি বাসনের বোঝা চুরি করে পালাচ্ছে, শীগগির দেখো গিয়ে। আমি তো এই অবস্থায়—ও

সত্যবাবু, ও অনিলবাবু, তোমরা কই ?'

আমি ধীর স্থস্থে ব্লেড্ মুছতে মুছতে বলি, আহা থাক্ থাক্, ওরা হয়তো ঘুমোচ্ছে। শুধু বাসন তো? টাকা-কড়ি, ঘড়ি-আংটি নয় তো? যাক্ গে অল্পের ওপর দিয়ে গেছে।'

আশুবাবু তো ছিটফিটিয়ে ওঠে, 'তুমি বল কি বিপিনদা? ঘড়ি আংটি নয় বলে নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকতে হবে? ওর মধ্যে আরও কি আছে তুমি জানো?'

'তুমিও জানো না।' আমি বলি, 'তবে খামোকা একটা লোককে চোর বলা কি ঠিক?'

আশুবাবু আরো ক্ষেপে যায়, 'তা চোর বলবো না তো কি সাধু বলবো? যে একটা রুমাল চুরি করে, সেও চোর, যে একটা চামচ চুরি করে সেও চোর। তোমার ওই আদরের রামহরি তলে তলে সর্বস্ব চুরি করেছে এই আমি বলে দিচ্ছি। বাক্স-প্যাঁট্‌রা, টাকা-কড়ি, সব রামহরির হাতে। এতো বিশ্বাস ভালো নয়। চোখের সামনে দিয়ে লোকটা মাল পাচার করে আসতে গেল দেখলাম, জেনে প্রতিকার করতে পারলাম না। উঃ! মরতে আমি নাইতে ঢুকেছিলাম। বলি ও অনিলবাবু ও সত্যবাবু, ঘুমিয়েছো না মরে আছো? বিপিনদার বিশ্বস্ত ভৃত্য সামনে দিয়ে—'

চেঁচামেচিতে ওরা উঠেই এলো। অবাক হয়ে বললো, 'ব্যাপার কী আশুবাবু?'

'ব্যাপার ওই বিপিনদাকে জিগ্যেস করো'—বলে রগচটা আশুবাবু চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমার যদি কিছু খোয়া গিয়ে থাকে তো আমি এই বিপিনদার কাছ থেকে আদায় করবো তা বলে রাখছি, হ্যাঁ। মরতে আমি নাইতে ঢুকেছিলাম। না হলে ব্যাটাকে গলায় গামছা দিয়ে টেনে এনে—'

কথার মাঝখানেই হঠাৎ আশুবাবু লম্বা করে জিভ বার করে বোঁ করে ছুটে নাইবার ঘরে ঢুকে দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে দেয়। বুঝতেই

পারছিস নিশ্চয় ব্যাপারটা ? রামহরির গলায় গামছার ফাঁস লাগাবার কল্পনায়—'

নাতনী কৃষ্ণা মুখে হাত চাপা দিয়ে খুক্ খুক্ করে হেসে বলে, 'উঃ দাদু, আপনি কী অসভ্য ?'

'এ্যাই ছ্যাখো ! আমি অসভ্য ? আমি কিসের অসভ্য ? ব্যাপারটা তো আশুবাবুর। যাক্‌গে মরুকগে, তখন বাকি সবাই উঠে এসে পড়ে জিগ্যেস করলো, কী ব্যাপার ! আমি বাবা সহজে ব্যাপারটা ভাঙলাম না। শুধু সংক্ষেপে বললাম 'ভোজ।'

'ভোজ।'

'হুঁ ভোজ। আজকের এই ছুটির সকালে সোনার আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ যখন মনে পড়ে গেল আজও হাতে ব্যথা, আজও রামহরির রান্না খেতে হবে, মাথায় খুন চেপে [illegible]। ব্যাস্, চাটুয্যেকে খুন করতে পাঠালাম।'

'চাটুয্যেকে খুন করতে পাঠালে ?'

'তাই তো পাঠালাম। রামহরিকে দিয়েই কাজটা সারলাম। এতোক্ষণে বোধহয় কাজটা সেরে ফিরছে রামহরি। এরপর আমরা চাটুয্যের শ্রাদ্ধের ভোজ খাবো।'

কৃষ্ণা বলে ওঠে, 'কী আবোল-তাবোল বকছেন দাদু ? মরার দিনই বুঝি শ্রাদ্ধ হয় ? আর মানুষ খুন হলে বুঝি—'

বড়কাকা স্মিতহাস্যে বললে, 'হ্যাঁ, ওরাও তাই বলে উঠলো, কী আবোল-তাবোল বকছো ? ডিটেকটিভ্ গল্প পড়ে পড়ে তোমার দেখছি মাথাফাতা—কাল সারারাত জেগে পড়েছো বুঝি ?'

আমি বললাম, 'এর উত্তর এক্ষুনি পাবে। ওই তো দেখো না চাটুয্যে ছুটে আসছে গুলি-খাওয়া বাঘের মতো।' এলো। সে এলো। এসেই একেবারে এই মারে তো সেই মারে। দু'হাত তুলে প্রায় গৌরাঙ্গ অবতার হয়ে লাফাতে সুরু করে। 'বলি বিপিনদা, তোমার ব্যাপারটা কী ? সক্কালবেলা—ওই দশটা থালা গেলাস আসন

পাঠাবার মানে?'

'মানে? মানে তুমি বুঝতে পারো নি?' খুব নিরীহ গলায় জিগ্যেস করি।

চাটুয্যে আরো লাফায়, 'পারবো না কেন? কিন্তু কেন শুনি? মাসের এই আটাশ তারিখে আমার ঘাড়ে এই গন্ধমাদন পর্বত চাপাবার হেতু? এই দশ-দশটা জোয়ানকে গেলাতে যাবো কেন আমি?'

আমি বুঝলি আরো নিরীহ গলায় 'বলি, কেন তোমার বাড়িতে থালা গেলাসগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে।'

'ওইটা একটা যুক্তি হলো?' চাটুয্যে চেঁচায়, 'এই দশটা গুণ্ডাকে গাণ্ডেপিণ্ডে গেলাতে কতো খরচা হবে সে হিসেব আছে?'

আমার গলা সমানেই ঠাণ্ডা বুঝলি? আমি বললাম, 'হিসেব কেন থাকবে না? পারহেড্ দু'টাকা করে সর্বসাকুল্যে কুড়ি টাকা।'

'পারহেড্ দু'টাকা।'

কৃষ্ণা হেসে ওঠে, 'তা'হলে তো খুব ভোজ দাদু? দু'টাকায় তো ভাত ডাল আলুভাতে হয়। বড়জোর একটা বিচ্ছিরি চচ্চড়ি। না কি ভোজটা ঝাল মুড়ির?'

বড়কাকা মধুর হাসি হাসেন।

'ওহে নাতনী, এই হিসেবটা কি তোমাদের আমলের? এ হচ্ছে আমাদের আমলের। পারহেড্ দু'টাকা বরং বেশীই ধরেছি, ওর কমেও হতো। দু'টাকায় তো রাজার খাওয়া। কী দাম ছিল তখন জিনিসের? বিশেষ করে ওই বাইরে-টাইরে। চার আনা করে পাকা রুইয়ের সের, ঘিয়ের সের আঠারো আনা, বারো চৌদ্দ আনায় ভালো দেরাদুন রাইস, মাংস পাঁচ আনা, মুরগী একজোড়া এক টাকা—'

কৃষ্ণা বাধা দিয়ে বলে ওঠে, 'আর কতো গুল ঝাড়বেন দাদু? এবার তা'হলে আপনাকে 'গুল-সম্রাট' উপাধিতে ভূষিত করতে হয়।'

'গুল মানে?'

বড়কাকা রেগে কাঁই হন।

'গুল মানে কি? এই এক ভাষা হয়েছে তোদের। আমাদের ছোটবেলায় আমরা কখনো এই গুল-টুল বলিনি।'

দাদুর উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে আর একজন এসে দাঁড়ায়। সেটি হচ্ছে সুশীলবাবুর সেজ ছেলে সুবল। সুবলটা অবশ্য তার ডাক নাম, খুব জমকালো একটা পোষাকী নাম তার আছে, কিন্তু সে নামটা জরির পোষাকের মতো তোলাই থাকে। অতএব ওই সুবল।

সুবল আবার বড়কাকে বলে 'কাকুদাদু।'

ইয়ারের রাজা, দুষ্টুর শিরোমণি এই সুবলটিকে বড়কাকা একটু ভীতির চক্ষে দেখেন। তাই সুবল যখন এসে বললো, 'কি হলো? কে কাকে গুল দিচ্ছে?'

তখন বড়কাকা বেজার গলায় বলেন, 'কেউ কাউকে দিচ্ছে না। তুমি আবার পড়া ছেড়ে উঠে এলে কেন? তোমার না এখন কলেজের পড়া?'

সুবল মুচকি হেসে বলে, 'তাতে কি? আমরা কি আর আপনাদের মতো ভালো ছেলে কাকুদাদু? আমরা পড়া তৈরি করার থেকে পড়া ফাঁকি দিতেই বেশী ভালোবাসি।'

'খুব কাজ করো।'

বড়কাকা উদ্দীপ্ত হন, 'বলি ফাঁকিটা কাকে দাও হে সুবলচন্দ্র। কাকে দাও? পড়াকে না নিজেকে?'

সুবলচন্দ্র চং করে মাথা চুলকে বলে, 'তাইতো, সেটা তো কখনো ভেবে দেখিনি।'

বড়কাকা বিজয়গৌরব-মাখা মুখে বলেন, 'এবার থেকে ভেবে দেখো। দেখো বুড়োর কথা ঠিক না ভুল। এখন ভাবছো কী মজা! পড়ায় ফাঁকি দিলাম, মা-বাপকে মাস্টারকে সবাইকে ফাঁকি দিলাম। ভবিষ্যতে অনুতাপানলে দগ্ধ হতে হতে বুঝতে পারবে কাকে ফাঁকি দিলাম।'

'কাকুদাদু, আপনি বুঝি ছেলেবেলায় থিয়েটার করতেন?'

বড়কাকা সন্দেহের গলায় বলেন, 'সেটা আবার তোমায় কে

বললো ?'

'কেউ বলেনি। আমারই হঠাৎ মনে হলো।'

'মনে হলো ? অমনি হঠাৎ মনে হলো ? কেন ?'

'তা কি করে বলবো বলুন ? হঠাৎ মনে হলো আপনাকে স্টেজে বেশ মানায়।'

বড়কাকা সহসা হাসি হাসি গলায় বলেন, 'তুমি হচ্ছো একটা পয়লা নম্বরের শয়তান। কী দেখে বুঝলে দাদু, আমায় স্টেজে বেশ মানায় ?' সুবলেতে আর কৃষ্ণাতে একটি দৃষ্টি-বিনিময় হয়। যার অর্থ—ক্ষেপেছে বুড়ো। সুবল হাসি গোপন করে বলে, 'হঠাৎ নজরে পড়লো আপনার চলা-ফেরা, কথাবার্তা, সবই বেশ নাটকীয় নাটকীয়।'

বড়কাকা হৃষ্টচিত্তে বলেন, 'শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর! ভারী আমার এক নাটক চিননেওয়ালা এলেন। তা বলেছিস অবিশ্যি মিথ্যে নয়। ওরাও বলতো এ কথা। আমাদের সেই 'বান্ধব নাট্য-সমিতি।' তখন আমি মোগলসরাইয়ে পোস্টেড্—'

'আগে রাঁচির গল্পটা শেষ করুন দাদু।' কৃষ্ণা বলে, 'তারপর কী হলো ?'

সুবল ভুরু কুঁচকে বলে, 'রাঁচিটা কী ব্যাপার ?'

কৃষ্ণা সেজদাকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে, 'তা দাদু বলেছেন দু'টাকায় নাকি তখন রাজার খাওয়া হতো। টাকায় চারটে করে মুরগী, টাকায় চার সের মাংস।'

'বাড়াচ্ছো—বেজায় বাড়াচ্ছো নাতনী, আমি বলছি টাকায় জোড়া—'

'ওই হলো।'

'ওই হলো না। ওই অনুপাতে তাহলে সবই বাড়বে।'...বড়কাকা বলেন, 'অবিশ্যি কৃষ্ণা যে খুব ভুল বলেছে তাও নয়। ছিল, টাকায় চার সের মাংসও ছিল! সেটা ছিল রঘুনাথপুরে—'

'আর দাদু, আপনার চাটুয্যের কী হলো, তাই বলুন।'

'বলছি তো! বলতেই তো বসেছি। তোরা ব্যাঘাত ঘটালে কী করবো? গল্পের মাঝখানে ব্যাঘাত আমার দু'চক্ষের বিষ! যারা ওই গল্পের রস গ্রহণ করতে চাও, তারা—চুপ করে শোনো।'

নিজে এতোটি ব্যাঘাত ঘটিয়ে বড়কাকা বলেন, 'হ্যাঁ কি বলছিলাম—?'

কৃষ্ণা বলে ওঠে, 'ওই যে দু'টাকায় ভালো খাওয়া কেন হবে না? জিনিস যখন এতো সস্তা? অথচ সেই চাটুয্যে—'

'হ্যাঁ, সেই চাটুয্যে।'

বড়কাকা যেন কোথাকার একটা বন্ধ দরজা খুললেন। যেন সেই দরজা দিয়ে ঘরের ভিতরের সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন।

যেন দেখতে পাচ্ছেন, চাটুয্যে কি পরিমাণ চেঁচামেচি করছে, কিভাবে দু' হাত উর্ধ্বে তুলে বলছে, 'কুড়ি টাকা বড়ো কম হলো? কুড়ি হাত মাটি খুঁড়ে কুড়িটা পয়সা বার কর দিকি? মাসের এই আটাশ তারিখে—উঁহু অসম্ভব। তোমার থালা গেলাস ফিরিয়ে আনো বিপিনদা।'

ঘরে যারা ছিল সত্য অনিল রজনী তারা অপমান অপমান মুখে বলে ওঠে, 'সত্যি বিপিনদা কী হচ্ছে? চাটুয্যেদা যখন এতো কাতর হচ্ছেন, না না তুমি ফিরিয়ে আনো ওসব।'

আশুবাবুও ততক্ষণে স্নান করে ফিরেছে, সেও বলে ওঠে 'চাটুয্যের এই অপমানের পর আমরা ওর বাড়িতে পাত পাড়বো বিপিনবাবু?'

'আমি বাবা ঘুঘু নাম্বার ওয়ান।'

আমি বলি, 'পাত কোথায় আশুবাবু? থালা তো! আর সেও আমাদের নিজেদের থালা। ফিরিয়ে আনা তো হতেই পারে না, আমার যে এটা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা! ফিরিয়ে আনলে ভবিষ্যতে সব পথই তো বন্ধ।...আর আসলে তো চাটুয্যের আপত্তিটা হচ্ছে মাসের আটাশ তারিখ বলে? কি বলো চাটুয্যে, তাই না? দোসরা হলে ওই উর্ধ্ব বাহু আরো উর্ধ্বে তুলে চাটুয্যে গান জুড়ে দিতো—

'বঁধু এসো হে এসো হে
দয়া করে কুটীরে আমারি।
কী দিয়ে পূজিব তু ষিব তোমারে
বুঝিতে না পা—আরি।'

কী বল চ্যাটুয্যে তাই না?'

তা চাটুয্যেও কম ঘুঘু নয়। বেগতিক দেখে অমনি বলে কিনা, 'তবে না তো কি? নইলে তোমরা দয়া করে আমার বাড়িতে দু'টো খাবে এ তো আহ্লাদের কথা। শুধু অভাবেই স্বভাব নষ্ট হচ্ছিল, মাথা ঘুরে যাচ্ছিল।'

'আমিও তো তাই বলছি'—বলে আমি ঘরে উঠে গিয়ে আমার তোরঙ্গ থেকে কুড়িটা টাকা বার করে চাটুয্যের হাতে দিয়ে বলি, তা ভাই তোমার টাকা আর আমার টাকা কি ভিন্ন? এই নিয়ে যাও। দোসরা তারিখে ফেরত দিলেই হবে।'

চাটুয্যের চোখ দিয়ে আগুন ছিটকে উঠলো। তবু চাটুয্যে দেঁতো হাসি হেসে বললো, 'ওঃ আট-ঘাট বেঁধেই কাজটা করেছ তাহলে? ঠিক আছে। আপনারা সব যাবেন ঠিক সময়ে। এমন খাওয়া খাওয়াবো কাল আর কাউকে অফিস যেতে হবে না।'

আশুবাবু চীৎকার করে ওঠে, 'বল কি চাটুয্যে? তার মানে? রান্নায় ক্যাস্টর অয়েল মিশোবে না কি?'

'এ মা!' কৃষ্ণা হি হি করে ওঠে, 'দাদু কী অসভ্য।'

'বাঃ চমৎকার! আমি হলাম অসভ্য। কথাটা কি আমার? ও তো আশুবাবুর। যাক চাটুয্যে তো শুনে একহাত ভিজ কাটলো।'

বললো 'এ কী বলছেন আশুবাবু? দুটো ভালো-মন্দ খাওয়াবো বলেই—'

চাটুয্যে চলে গেল টাকা নিয়ে বাজারের দিকে।

আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'দশটি ব্রাহ্মণ ভোজনের পূণ্যলাভের সহায় হলাম আমি আজ তোমার, বুঝলে চাটুয্যে।'

চাটুয্যেও চেঁচিয়ে বললো, 'সবাই ব্রাহ্মণ ?'

আমি আরো চেঁচালাম, 'নিশ্চয়। অতিথি হচ্ছেন নারায়ণ আর নারায়ণের তুল্য বড় ব্রাহ্মণ আর কে আছে ?'

চমৎকার !

সুবল বলে, 'কাকুদাহুর আর্গুমেণ্টটি তো বেশ।'

বড়কাকা মাথাটি ছুলিয়ে বলেন, 'তা ওরকম আমি বলতাম বুঝলি। ...যাক্ খাওয়ানোটা যা করেছিলো চাটুয্যে, সত্যিই বলবার মতো। পোলাউ, মাংস, ছু-তিন রকম মাছের তরকারি, চাট্‌নী, মিষ্টি এলাহি ব্যাপার ! ...ব্যাস্ খুলে গেল আমাদের কপাল।'

'কপাল খুলে গেল মানে ?'

কৃষ্ণা অবাক হয়ে যায়।

বড়কাকা মিটি মিটি হাসেন।

'আরে সেইটাই তো মজা ! চাটুয্যের বাড়ি খেয়ে এসে আমরা পরদিন থেকে অফিসসুদ্ধ সকলকে বলে বেড়াতে লাগলাম চাটুয্যে যেমন খাইয়েছে এমন খাওয়ানোর সাধ্য কারো নেই। আর চাটুয্যে-গিন্নীর রান্না ? আহা, যেন অমৃত !'

তার পরের ঘটনা হলো এই—প্রতি রবিবারের সকালে এক এক করে বাবুর বাড়িতে থালা গেলাস আসন চলে যায়। আর ছুপুরে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয়র বন্যা বয়ে যায়। মানে টেক্কা দেওয়ার মনোভাবটি তো সকলেরই আছে ! অমুক এই খাইয়েছে ? আমরা আরো খাওয়াই।

ইস্, কী বোকা ! কী বোকা !

কৃষ্ণ হাততালি দিয়ে ওঠে, 'আপনাদের আমলের লোকগুলো কী হাঁদা ছিল দাহু। এইভাবে ঠকতো ?'

বড়কাকা রোষরক্তিম লোচনে বলেন, 'হাঁদা মানে ? ঠক্‌তো মানে ? আমোদটা বুঝি কিছু না ? ওরাও আমোদ পেত না ? ক্রমশঃ তো দশজন থেকে পঁচিশ ত্রিশ জন হতে লাগলো। মানে যারা মেস

করে থাকে না তাদেরও সবাই নেমন্তন্নে ডাকতে লাগলো। অর্থাৎ প্রতিটি রবিবার যেন একটি উৎসব। একে বলি আমোদ-আহ্লাদ। আর তোদের এ যুগে? নিজের লোক বেড়াতে এলো তাকে এক পিয়ালা চা আর দুটো সিঙাড়া দিয়ে হয়ে গেল। খাওয়া-দাওয়ার ঘটা না হলে আমোদ আর হবে কোথা থেকে? আমরা বাড়িতে কেউ এলে তার জুতো লুকিয়ে রাখতাম জানিস?'

কখন যে কৃষ্ণার মা এসে একধারে দাঁড়িয়েছিলেন আর সব কথাগুলি শুনছিলেন কে জানে। হঠাৎ বলে ওঠেন, 'বারো আনা সেরের দেরাদুন রাইস আর চার আনা সেরের পাকা রুই হলে আমোদ-আহ্লাদ সবাই করতে পারে বড়কাকা। আপনার সেই চাটুয্যে কোম্পানী যদি পড়তেন এই র‍্যাশানের পাল্লায় আর কুড়ি টাকা সেরের গলদা চিংড়ির পাল্লায় তো দেখতাম।'

বড়কাকা তাঁর বৌমার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে অসন্তুষ্ট গলায় বলেন, 'এই তোমাদের একটি মহাদোষ বৌমা, সব কিছুতেই র‍্যাশানের ছুতো করা।'

'আরে বাবা, আমোদ-আহ্লাদের ইচ্ছে থাকলে বিনি খরচেও হয়। ওটা হচ্ছে মনের ব্যাপার।'

বৌমা চৌকীর একপাশে বসে পড়ে বলেন, 'নিখরচায় কি কি আমোদ হয় বলুন তো শুনি।'

বড়কাকা উদ্দীপ্ত গলায় বলেন, 'শুনতে চাইছো? শোনবার সময় আছে তোমার? সেটা শুনেও গায়ে একটু বল পেলাম বৌমা। এই তো গল্পগাছা করাও তো একটা আমোদ-আহ্লাদ। তা কই সেটুকু করতেও তো দেখিনি তোমাদের। সর্বদাই সময় নেই, সময় নেই।...বিনি খরচের আমোদের কথা শুনবে? তাহলে শোনো, আমি তখন গাজীপুরে, চমৎকার একটি বাসা জোগাড় হয়েছে, সঙ্গে যথারীতি দু'তিনটে ছেলে জুটিয়ে তোফা আছি। বাড়ির চারদিকে গোলাপের বাগান, সাদা, গোলাপী, লাল নানা গোলাপের ছড়াছড়ি। সন্ধ্যেবেলায় মনে হয়

যেন স্বর্গে বাস করছি—

কথার মাঝখানে সুবল বলে ওঠে, 'চারপাশে গোলাপের বাগান? ওতে আর কি হল কাকুদাহু? বরং চারপাশে পুঁইশাক কুমড়ো শাক কচু ঢ্যাড়শ ও কাঁচকলার গাছ থাকলে আপনার স্বর্গ মনে হতো।'

বড়কাকা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন, 'তুমি থাম তো হে ডেঁপো ছোকরা, তোমার সঙ্গে কথা হচ্ছে না। যে পুঁইশাক খায় সে আর গোলাপের গন্ধ শোঁকে না না? ...তা বুঝলে বৌমা সবই বেশ ভালো তবু যেন মন বসতে চায় না। সর্বদাই প্রাণ হু হু করে—'

'ইস্!'

কৃষ্ণা সেই সময় টুক্ করে বলে বসে, 'সেই সময় যদি একটা বিয়ে করে ফেলতেন দাহু, তাহলে আমাদের বেশ একখানি গোলাপী গোলাপী গাজীপুরী দিদা থাকতেন।'

বড়কাকা কিন্তু এবারে আর ক্রুদ্ধ হলেন না। গোঁফের ফাঁকে একটু হেসে বলেন, 'তোমার এই একরত্তি ছেলেমেয়েগুলো তো আচ্ছা ডেঁপো হয়েছে বৌমা! মায়ের সামনে এইসব পাকামি।'

বৌমাও হেসে বলেন, 'মায়ের সামনে? মায়ের সঙ্গেই চালাচ্ছে। মা-বাপ কাউকেই রেয়াৎ দেয় নাকি ওরা?'

কেন কে জানে বড়কাকার খুব হাসি পেতে থাকে। তবে সেটাকে গোঁফ মুছতে মুছতে সামলে নিয়ে বলেন, 'এইসব হচ্ছে একালের শিক্ষার কুফল। আমরা? তের বছর বয়স থেকে সিগ্রেট ধরেছি বটে, কিন্তু কেউ বলুক দিকি বড়রা কেউ কোনদিন চোখে দেখেছে?'

সুবল হেসে ওঠে, 'বাঃ, কাকুদাহু বেশ! অকাজটি করতে দোষ নেই, শুধু বড়রা দেখলেই দোষ?'

বড়কাকা গম্ভীর ভাবে বলেন, 'দেখো হে এঁচড়ে পাকা ছোকরা, তোমার সঙ্গে আমি তর্কে পারবো না। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ওই রকমই ছিল। আমরা মনে করতাম সবাই তো আর রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির হয় না। তবে বড়োদের সামনে স্বরূপটা প্রকাশ করা হচ্ছে তাদের অপমান

করা। তাঁদের সামনে নিজেদের স্বরূপটি লুকিয়ে রাখাই হচ্ছে সমীহ করা।'

'বাঃ! চমৎকার জীবনদর্শন তো!'

হেসে ওঠে সুবল।

বড়কাকা চড়া গলায় বলেন, 'তোমাদের মতন বাপের নাকের ওপর সিগ্রেট খেলে কী হয় বলে তর্ক করার থেকে ওটাই ভালো মনে করতাম আমরা বুঝলে? যাক কথাটা তো সিগ্রেটের নয়, কথাটা হচ্ছে আমোদ-আহ্লাদের।...তা সেই বাবদই বলি। আমার সঙ্গে যে ছোকরা এ্যাসিস্‌টেন্‌টটা থাকতো, নাম বাসুদেব ঘোষাল, হঠাৎ তার বাড়ি থেকে এক টেলিগ্রাম এসে হাজির ঃ

'শীঘ্র চলে এসো, বিবাহের দিন স্থির।'

—বাবা

ছোকরা তো হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির। 'বিপিনদা গ্যাখো কী বিপদ!'

আমি বলে উঠি 'বিপদ কী বাসুদেব, এ তো রীতিমত সম্পদ। তোমায় একটি আঙুল নাড়তে হলো না, এমন কি একটু ইচ্ছে প্রকাশ করতে পর্যন্ত হলো না, দিব্যি বিবাহের দিনস্থির। এ তো ভাগ্যের ব্যাপার! বিয়ে বলে কথা। সালঙ্কারা একটি কন্যা তো পাবেই। তাছাড়া নিজেও কোন না ঘড়িটা আংটিটা বোতামটা গরদের জোড়টা পাম্পসু জুতোটা—'

বাসুদেবের চোখে স্বপ্নের ঘোর, কিন্তু মুখে বিব্রত ভাব।

বাসুদেব মুখে সেই ভাবটি বজায় রেখে আর গলায় সেই ভাবের সুরটি এনে বলে, ঘড়ি বোতাম তো একদিনের, বিয়েটা যে চিরদিনের বিপিনদা। জানলাম না, শুনলাম না—'

আমি রাগ দেখিয়ে ধমক দিই, 'তোর মা-বাপ কি না জেনে শুনেই একটা যাচ্ছেতাই মেয়েকে তোর গলায় চাপাচ্ছেন?'

বাসুদেব মিইয়ে গিয়ে বলে, 'তা ঠিক নয়। মানে—'

'মানেটা কি? বলি মানেটা কি?'

আরো ধমক দিই আমি।

ছোকরা আরো মিইয়ে বলে, 'না মানে—এইতো রোজকার, এই অবস্থায় বিয়ে—'

আমি আরও দুই ছোকরা আর রামহরি তিনজনে তারস্বরে বলে উঠি, 'বৌ এসেই কি এক্ষুনি তোমার স্কন্ধে ভর করবে বাসুদেব? তোমার বাবার হাঁড়িতে ভাত নেই?'

বাসুদেব লজ্জায় 'এতোটুকু' হয়ে যায়।

তারপর ঝটপট ব্যবস্থা চলে।

ছুটির ব্যাপার তো আমারই হাতে? হয়ে যায় ছুটি। ওদিকে শ্যামল চলে যায় রেলবাবু সরকার মশাইয়ের কাছে 'পাস' যোগাড় করতে—আর রামহরি তাড়াতাড়ি গাড়ির খাবার করে ফেলতে যায়।

বাসুদেব কেবলই বলে, 'একটা চিঠিপত্র না দিয়ে হঠাৎ এ রকম টেলিগ্রাম। আমার কেমন যেন আশ্চয্যি লাগছে বিপিনদা', আর আমি ততই উৎসাহ দিয়ে বলি, 'আহা, হঠাৎই হয়তো ঠিক হয়ে গেছে। হয়তো কোনো পরমা সুন্দরী মেয়ে জুটে গেছে। নয়তো সে খুব একটা দাঁওয়ের ব্যাপার হয়েছে—'

ভেতরে পুলক, ওপরে লজ্জা নিয়ে আর সাত দিনের ছুটি নিয়ে বাসুদেব রেলগাড়িতে চড়ে বসে। আমরা উল্লাসভরে হাত নাড়ি, আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলি, 'বিয়েবাড়ির মণ্ডাটণ্ডা কিছু এসে যায় যেন বাসুদেব! ইতর জনের জন্যে তো বরাদ্দ ওই মিষ্টি।'

তারপর—

বড়কাকা মুচকে হেসে বলেন, 'তারপর অবশ্য বুঝতেই পারছিস ব্যাপারটা? সাতদিন আগেই ফিরে এলো বাসুদেব।'

মুখে লজ্জা অপমান রাগ আর আশ্চয্যির কালো ছাপ।

আমরা সেদিকে দৃক্‌পাত মাত্র না করে বলে উঠি, 'কই বাসুদেব মণ্ডা কই?'

বাসুদেব সে কথার উত্তর না দিয়ে কালো মুখ আরো কালো করে চড়া গলায় বলে, 'বিপিনদা, সেই টেলিগ্রামটা দেখি।'

আমি তো আকাশ থেকে পড়ি!

'কোন্ টেলিগ্রাম?'

'কোন্ টেলিগ্রাম আবার? টেলিগ্রাম আবার কটা এসেছে? সেই অদ্ভুতটাই।'

আমি আরো সমঝাই, 'মানে সেই তোর বিয়ের খবর দেওয়াটা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কই সেটা?'

'কী আশ্চর্য, সেটা আমি কোথায় পাবো? তোর টেলিগ্রাম তুই নিলি।'

'আমি আবার কখন নিলাম?' বাসুদেব রক্তচক্ষে বলে, 'তোমরাই পড়ে শুনিয়েছো।'

রামহরি পূর্ব শিক্ষা মত বলে ওঠে, 'সে কী দাদাবাবু! আপনার ঘরে বিছানার ওপর নিজের চক্ষে দেখেছি আমি। তাহলে বোধহয় ঝাড়ুর আগায় চলে গেছে।'

বাসুদেব তাকে এই মারে তো সেই মারে! 'ঝাড়ুর আগায় চলে গেছে? একি মামদোবাজী নাকি? কোথায় সেই টেলিগ্রাম বার করো। বার করতে না পারলে তোমার গর্দান নেবো আমি। তোমায় খুন করে ফাঁসি যাবো।'

আমরা ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাতে মুখে জল দেওয়াই। চোখ কপালে তুলে বলি, 'কিন্তু বিয়ের খাওয়া তো চুকে গেছে, এতোদিন পরে সেই টেলিগ্রাম দিয়ে কি হবে?'

'হবে আমার মাথা আর মুণ্ডু। রামহরি বার করো। বার করো বলছি। নইলে তোমার গর্দান নিয়ে তবে আর আমার কাজ।'

আমি খুব নরম গলায় বলি, 'কিন্তু ব্যাপার কি বলতো বাসুদেব? বৌ বুঝি খুব কালোটালো? পছন্দ হয়নি?'

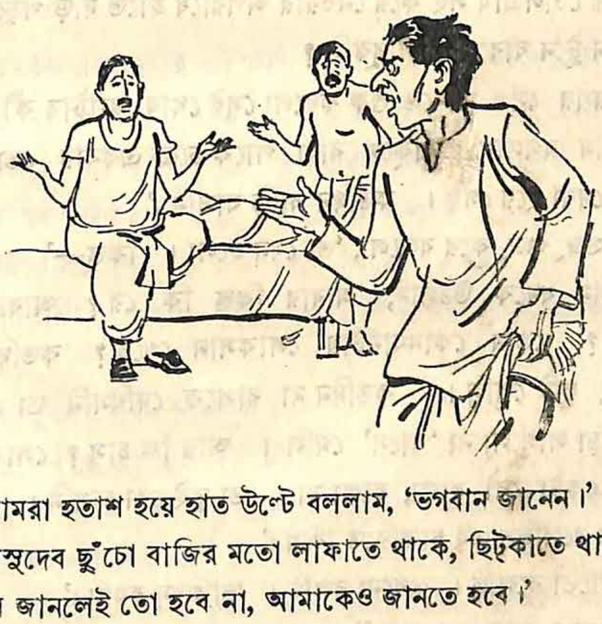
বাসুদেব ধেই ধেই করে নেচে ওঠে, 'কালোটালো! পছন্দ হয়নি!

মূলে মা রাঁধে না তার তপ্ত আর পান্তো। গিয়ে দেখি—সব ভোঁ ভাঁ ফক্কিকারি! সুটকেস নামাতে না নামাতে সবাই মিলে ছেঁকে ধরতে এলো, 'হঠাৎ চলে এলি যে? কী হলো? চাকরি গেল না কী? কোন খবর টবর না দিয়ে'—আর আমি টেলিগ্রামের কথা তুলতেই আকাশ থেকে পড়লো যেন। ……সেই টেলিগ্রামখানা আমি দেখতে চাই।'

পাবার কথা নয়, তবু কি আশ্চর্য পাওয়া গেল। বাসুদেবের চৌকিতেই পাওয়া গেল। বিছানার তলায় গোঁজা রয়েছে।

আশ্চর্য ঘটনা, এখন দেখা গেল টেলিগ্রামখানা বাসুদেব ঘোষালের নামে নয়, বাসুদেব ঘোষের নামে।

বাসুদেব টেলিগ্রামখানা পা দিয়ে মাড়িয়ে বলে, 'কে এই বাসুদেব ঘোষ?'



আমরা হতাশ হয়ে হাত উল্টে বললাম, 'ভগবান জানেন।'

বাসুদেব ছুঁচো বাজির মতো লাফাতে থাকে, ছিটকাতে থাকে, শুধু ভগবান জানলেই তো হবে না, আমাকেও জানতে হবে।'

তখন আমি উল্টো গাইতে শুরু করলাম।

সেই অজানা বাসুদেব ঘোষের জন্যে 'হায় হায়' জুড়ে দিলাম। সে

বেচারার যে এই 'ভয়ঙ্কর দরকারি' টেলিগ্রামটা না পেয়ে জীবনে কী লোকসান হয়ে গেল সেটাই বিস্তার করতে লাগলাম। তার সেই অজানা জনেদের বাড়ির কী ঘটলো তারই আলোচনা চালাতে লাগলাম রাহরির সঙ্গে। তবে একটু ঠাণ্ডা হলো ছোকরা। তারপর বললো, 'কিন্তু পোস্টম্যানকে আমি ছাড়বো না। এই রকম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা!

তখন বুঝলি, প্রমাদ গণলাম।

ছিল তো আসলে ঘোষালের নামেই। শুধু ওর অনুপস্থিতিতে দুটো অক্ষর জলে ভিজিয়ে তুলে নিয়ে মেরে দিয়েছি।

অতএব আবার কৌশল।

হাঁ হাঁ করে উঠলাম। বললাম 'সর্বনাশ করিসনে বাপু। নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনিসনে। তুই দোষ দিতে গেলে ও উল্টে দোষ দেবে—বাবু কেন সই করে নিলো? বাবু কি মুখ্যু? তখন? তখন যে পরের টেলিগ্রাম সই করে নেওয়ার অপরাধে হাতে দড়ি পড়বে।'

শুনে টুনে ঘাবড়ে গেল বুঝলি?

তারপর সেও ভাবতে শুরু করলো সেই ঘোষ ব্যাটার কী হলো।

আমি বললাম, 'যাক্‌গে বাবা পাকে-চক্রে একবার তো মায়ে-ছেলেয় দেখা হয়ে গেল। কতদিন বাড়ি যাসনি।'

ও গুজ্ গুজ্ করে বললো, 'তা যেন হলো। কিন্তু—'

আমি ধমকে উঠলাম, 'আবার কিন্তু কি রে? আবার কিন্তু কিসের? তোর কোনখানটায় লোকসান গেছে? কতদিন ছুটি পাসনি, ছুটি পেলি। কতদিন মা বাপকে দেখিসনি তা দেখলি। রেলভাড়া লাগলো না 'পাসে' গেলি। আর কি চাস? লোকসানের মধ্যে একটা বৌ হতো, হলো না। তা তুই তো চাসনি। তুই তো বারবার বলেছিস এই চাকরিতে বিয়ে।'

'তাতো বলেছি। এখনো বলছি। ভাগ্যিস্ হয়নি।'

'তবে? তবে আবার কি? এমন একখানা মজার নাটক হলো সেটা দেখলি তো? খরচার মধ্যে আমার এক টাকা বারো আনা।'

বাসুদেব ভুরু কুঁচকে বলে, 'তোমার? তোমার এক টাকা বারো আনা মানে? কিসের?'

'আরে, ওই টেলিগ্রামটার।'

'টেলিগ্রামটার!'

আবার ছুঁচোবাজির মতো ছিট্‌কে ঘরঘরিয়ে ঘরময় পাক খেয়ে নেয় বাসুদেব, 'এটা কী হলো? টেলিগ্রামটা কি তুমি পাঠিয়েছিলে?'

আমি পায়রার পালক দিয়ে কান-চুলকোতে চুলকোতে বলি, 'এতক্ষণে অনুধাবন করলে?'

কৃষ্ণা বলে, 'কিন্তু আপনি কোথা থেকে পাঠালেন?'

'কতো জায়গায় টুরে যেতে হতো। কোথা থেকে যেন দিয়েছিলাম। তা এই তো দেখলি ফন্দী? নিখরচায় আমোদ-আহ্লাদ।'

কৃষ্ণার মা কাজের জন্যে উঠে যেতে যেতে বলেন, 'কিন্তু সে বেচারার—'

'সে বেচারার আবার কী ক্ষতি হলো বৌমা? কী ক্ষতিটা হলো? একমাত্র বলতে পারো দিন দুই বিয়ের স্বপ্ন দেখলো, সেটা হলো না। আরে বাবা! স্বপ্ন তো ভাঙবারই জিনিস, ভাঙবেই। ও যদি সত্যি ঘুমিয়েই স্বপ্ন দেখতো? ওই দেখাটাই লাভ। না না ও ছোকরা পরে ওই নিয়ে আমার বুদ্ধির খুব তারিফ করলো। এই বিপিন শর্মার মাথাটিকে— হাচ্চ বলে বৌমা যে চলেই গেলে! তা বুঝলি সুবল—'

কিন্তু সুবলও তখন ভাগল্‌বা।

এতোক্ষণ যে বসেছিল এই ঢের!

নেহাৎই আজ বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছিল। বড়কাকা আবার যেই একা সেই একা।

সেই অকারণ এঘর-ওঘর করে ঘুরে বেড়ান, অকারণ একালের নিন্দে করেন, আর বাকি সময়টা বসে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবরের কাগজ পড়েন।

আর কি ? আর কোন কাজ আছে ?

আর শুধু নাওয়া আর খাওয়া, প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে। সুশীলবাবু আফিস বেরিয়ে যান, বারান্দা থেকে জুলজুল করে তাকিয়ে দেখেন বড়কাকা আরো ভাবেন, দুর ছাই অন্য কোথাও চলে যাই। কিন্তু কোথায় যাবেন ? কাদের কাছে ? সবই তো ঘুরে আসা হয়েছে, দ্বিতীয়বার তো ডাকে না কেউ।

না ডাকলে যাবেন কেমন করে ?

নাঃ, দ্বিতীয়বারের যাওয়াটা না ডাকলে যাওয়া যায় না।

এমনি এক শূন্যতার মধ্যে হঠাৎ এক পরম ডাক এসে গেল বড়কাকার।

দ্বিতীয়বারের ডাক।

না না 'শেষের সে দিনের ডাক' নয়, এ এক অপ্রত্যাশিত ডাক। এ-ডাকের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না বড়কাকা। অর্থাৎ স্বপ্নেও কোনদিন আশা করেননি তাঁর জীবনে আবার এমন ডাক আসবে।

পুরনো অফিস আবার ডাকছে তাঁকে।

খবরটা দিলো সুবলের ছোট ভাই ফুটবল।

নিচে থেকে উঠে এসে বললো, 'কাকুদাদু, তোমার আফিসের একজন লোক এসেছে। তোমার আফিসের লোক।'

বড়কাকার দৃষ্টির সামনে বিশ্বজগৎ যেন বোঁ করে একটা পাক খেয়ে গেল। বড়কাকা চোখে ধোঁয়া দেখলেন। তারপর বড়কাকা চাপা গলায় ধমক দিয়ে উঠলেন নাতিকে, 'ছটফট করছিস্ কেন ? দাঁড়িয়ে বল না কথাটা কী ?'

ফুটবল অবশ্য দাঁড়িয়েই ছিল, এখন ডিগবাজি খেতে খেতে বললো, 'তোমার আফিসের বাবু। চিঠি নিয়ে এসেছে। যাওনা দেখগে না।'

বড়কাকা বসেছিলেন, দাঁড়িয়ে উঠলেন। পা-দুটো একটু কেঁপে গেল। দৃঢ় হলেন। বাইরে বেরোবার শার্টটি আলনায় ঝুলছিল পেড়ে গায়ে দিলেন। তারপর সিঁড়ির রেলিং ধরে ধরে নেমে গেলেন।

বসবার ঘরে সত্যিই একটি ছোকরা বসেছিল।

বেঁটে-খাটো গড়ন, কোঁকড়া ধরনের চুল, সরু সরু মেয়েলি গলা। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললো, 'আপনিই বিপিন বাবু?'

বিপিনবাবু আস্তে আস্তে মাথা হেলালেন।

ছোকরা তেমনি মিহি গলায় বললো, 'আচ্ছা, আপনার ঈশান বাবুকে মনে আছে? ঈশান বোস? তিনি তো আপনার নাম খুব করেন।'

বড়কাকার অবশ্য ওই ঈশান বোস নামটা মনে পড়লো না। কিন্তু যে লোকটা তাঁর খুব নাম করে, তাকে মনে না পড়াটা শোচনীয় লজ্জার কথা, তাই বড়কাকা হাঁ হাঁ করে বলে ওঠেন, 'মনে আবার নেই? খুব মনে আছে। কোথায় সে?'

ছোকরা নম্র বিনয়ে বলে, 'এখন ছেলের কাছে বাঙ্গালোরে রয়েছেন। তিনি আমার মেসোমশাই।'

কেউ কারো মেসোমশাই হওয়াটা এমন কিছু আশ্চর্য ঘটনা নয়, তবু বড়কাকা ব্যাপারটা শুনে যেন বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। বড় কাকার কণ্ঠে সেই পরম বিস্ময়ের কথা হয়ে ফুল্‌কি কাটতে লাগলো, 'বল কি? ঈশান তোমার মেশোমশাই? আশ্চর্য তো! তবে তো বাপু তোমায় 'তুমি' বলে কিছু অন্যায় করিনি। ঈশান তোমার মেসোমশাই। বড় ভালো লোক। আর কী ভাবই ছিল আমার সঙ্গে।'

ছোকরা পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে বলে, 'উনিও তো তাই বলেন। আর বলেন, আপনার হাতের রান্না যে কতো খেয়েছেন! এমন রান্না নাকি তিনি জীবনে খাননি।'

আর সংশয় থাকে না।

স্মৃতিতে কিছু ছায়া পড়লেও আর সবই তো স্পষ্ট পরিষ্কার।

বড়কাকা হেসে উঠে বলেন, 'এখনো বুঝি তেমনি পাগলা

আছে সে ?'

ছোকরা মৃদু হেসে বলে, 'খুব খোলামেলা ! আপনি তাঁকে কী যেন একটা অদ্ভুত ডাক নামে ডাকতেন, সেই নিয়ে কতো কথা। তিনিই আমার চাকরিটা করে দিয়েছেন।'

বড়কাকা যেন মহাসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে একটি তৃণখণ্ড পান। ডাকনামে ডাকতেন। ওঃ তাই ! তাই ভালো নামটা মনে পড়ছে না। হ্যাঁ, এমন অনেককেই তিনি এক একটা সৃষ্টিছাড়া নাম দিয়ে ডাকতেন। সেটা শুনলেই—

ব্যগ্র গলায় বলেন, 'সেই ডাকনামটা কী বল তো ?'

ছেলেটা কুণ্ঠিত হাসি হেসে বলে, 'কী যেন একটা, ভুলে গেছি।'

ভুলে যাওয়াটা অবশ্য উচিত হয়নি ওর।

বড়কাকা মনে মনে একটু বিরূপ না হয়ে পারলেন না।

কেন হে বাপু ভুলে যাওয়া কেন ?

যে মেসো তোমার চাকরি করে দিল, তুমি তার দু'টো নাম মনে রাখতে পারলে না ?

আর কেউ হলে হয়তো বড়কাকা তাকে দু'কথা শুনিয়ে দিতেন, তবে এ হচ্ছে স্বর্গদূত, তাই সে-সব না করে বলেন, 'তা সে এখন করছে কী ?'

'আর এখন কী করবেন ? রিটায়ার করে ছেলের কাছে চলে গেছেন। বাত, ডায়বিটিস, হাই-প্রেসার।'

'ইস্।' বড়কাকা চমকে ওঠেন, 'একসঙ্গে এতো !'

'সেই তো কথা !'

ছোকরা পকেট থেকে একটি চিঠি বার করে বড়কাকার সামনে ধরে দেয়, 'এই তো আপনার মতো ওঁকেও আফিস থেকে 'অফার' দিয়েছিল, কিন্তু ওই শরীর। যাই বলুন আপনি শরীরটাকে রেখেছেন ভালো।'

শরীরের কথা উঠলে বড়কাকা পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। কিন্তু আপাততঃ এখন ওই 'অফার' শুনেই তিনি দিশেহারা হয়ে গেছেন।

'কিসের অফার ?'

হাত বাড়িয়ে নিয়ে ক্ষীণ গলায় বলেন, 'কিসের চিঠি ?'

'ওই তো ! যার জন্যে আমার আসা। আফিস থেকে আপনাকে আবার ডেকেছে। সেই চিঠি।'

'আফিস থেকে আমায় আবার ডেকেছে ?'

মনে হলো বড়কাকা যেন একটা হাঁড়ির মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে কথা বলছিল।

ছোকরা অতোটা খেলাল করলো না। সমান মিহি গলায় বলে চললো, 'ওই তো মজা ! আমরাও তো প্রাণপাত করে খাটছি, কিন্তু সে কাজ নাকি আগেকার মতো হচ্ছে না। বুঝুন ? অতএব ডাক পুরনোদের। মেসোমশাই তো পারবেন না জবাব দিয়েছেন। এখন আপনি—'

এখন আপনি !

বিপিনবাবুর মনে হলো তিনি যেন প্রচণ্ড মরুভূমির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে এক পসলা বৃষ্টি পেলেন।

অথবা যেন মরিচের ঝাল লেগে যাওয়া জিভে পেলেন জলযোগের চিনি পাতা দই।

তবু বিপিনবাবুর যেন বিশ্বাস হয় না।

চিঠিটা খুলতে হাত কাঁপে।

বলেন, 'আচ্ছা তুমি বোসো, একটু চায়ের কথা বলে আসি।'

ও ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে, 'না না—আবার চা কেন ?'

বিপিনবাবু দরাজ গলায় বলেন, 'চা কেন মানে ? চা না খাইয়ে তোমায় ছাড়ছে কে ?'

নিজের কথাটাই হঠাৎ নিজের কানে যেন মধুবর্ষণ করলো বড়কাকার। আহা ! কতোদিন এমন দরাজ গলায় আপ্যায়নের কথা বলেন নি। হোক পরবর্তীকালের তবু সেই এক আফিসেরই তো। সহকর্মীর ভাব অনুভব করলেন বড়কাকা। আর সেইজন্যেই মনে

হলো যেন কতোকালের আপন।

যেন কতোবার দেখেছেন।

বাড়ির মধ্যে এসে গৃহকর্তা-গৃহকর্তা গলায় বললেন, 'নাতবৌমা, বাইরে এক কাপ চা আর কিছু বিস্কুট-টিস্কুট পাঠিয়ে দাও তো।'

মনে মনে বললেন, আর কিই বা দেবে? তোমাদের তো ওই বিস্কুটই সার! এ কি আর আগের আমল যে, অতিথি এলেই পাঁপর-ভাজা হলো, বেগুনীভাজা হলো। নচেৎ হিঙের কচুরী আলুর দম এসে গেল।

নাতবৌ নরম চোখ তুলে নরম গলায় বলে, 'কে এসেছে কাকুদাহ্?'

কাকুদাহ্ অবলীলায় বললেন, 'আমার আফিসের একটা ছেলে। আফিসের কি চিঠি নিয়ে বুঝি এসেছে। ভগবান জানেন আবার কিসের ফেরে ফেলতে চায়। আমি বাবা কোন্‌কালে রিটায়ার করেছি। খাই-দাই বাঁশী বাজাই, আমাকে তোদের আবার কী দরকার!'

প্রশ্নটা অবশ্য সেই আফিসকেই তবু উত্তরটা নাতবৌমা দেয়।

বলে, 'হয়তো পুরনো কোনো টাকাকড়ি পাওনা ছিল আপনার, তাই দিতে এসেছে।'

বড়কাকা মাথা নাড়েন।

বলেন, 'পাওনা-টাওনা কিছু ছিল না নাতবৌমা! বিদায়কালে সুদের সুদ তস্য সুদ কষে পাই-পয়সাটি পর্যন্ত গুণে দিয়ে দিয়েছে।'

নাতবৌমা যেন বিপিনবাবুর চিন্তার ভাগীদার হয়। আরো নরম গলায় বলে, 'তাহলে হয়তো আপনার পুরনো কোনো বন্ধুর ছেলের বিয়ে-টিয়ে—'

বিপিনবাবু আবার মাথা নাড়েন, 'না না, সেসব কিছু না। সাদা কাগজে, মনে হলো টাইপ করা চিঠি। বললো, 'অফার' দিয়েছে। এখনো পড়িনি। একটু ভয় ভয় করছে, বুঝলে নাতবৌমা, খাম খুলে পড়তে ভরসা হচ্ছে না।'

'ও মা কেন? ভয় কিসের?'

নাতবৌ হেসে ওঠে, 'ফাঁসির হুকুম তো আর আসেনি ? সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডেরও নয় নিশ্চয় ?'

যেন অগ্রাহ্যভরে 'ভগবান জানেন কিসের হুকুম', বলে বড়কাকা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান।

যদিও বড়কাকা ব্যাপারটাকে 'কিছুই নয়' ভাবে তাচ্ছিল্য দেখাতে চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁর গলার স্বরে পুলক-কম্পন গোপন থাকে না। যেমন নতুন বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বেড়াতে এলে ছেলেরা তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, 'মা দেখো ওখান থেকে কে সব এসেছে !' আর সেই তাচ্ছিল্যের মধ্যে থেকেই ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দেয় পুলক উল্লাস উৎকণ্ঠা। বড়কাকারও প্রায় সেই অবস্থা।

চিঠি খুলে বড়কাকার হাত পা থর থর করে কাঁপে। সত্যিই কোম্পানী আবার তাঁকে ডেকে চাকরি দিতে চাইছে ! এমন অদ্ভুত ঘটনাও ঘটে। বড়কাকার মনে পড়লো কতোদিন যেন আগে কেবলই কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখতেন, 'অঘটন কাজও ঘটে।'

সেইটা বার বার মনে পড়তে থাকে বড়কাকার।

বড়কাকার চোখের সামনে যেন একটি স্বপ্নময় পরীরাজ্যের দরজা খুলে যায়।

আহা ! কী মধুর মোহন মোহময় সেই রাজ্যটি।

আবার তিনি বিপিনদা !

দাদু নয়, কাকুদাদু নয়, বড়কাকা নয়, সেই আদি ও অকৃত্রিম 'বিপিনদা।'

আবার সেই রোমাঞ্চকর জীবন !

সেই ডিউটি মাফিক ভাত খেয়ে ফর্সা ধুতির ওপর ধোপভাঙা কোটটি চাপিয়ে আর কোটের ওপর চাদরটি ঝুলিয়ে, পানের কৌটোটি পকেটে নিয়ে আফিসযাত্রা। আহা ! কী আনন্দ ! কী আনন্দ !

যে ছেলেটি এসেছিল সে বেশীক্ষণ বসতে চাইছিল না, তবু বিপিনবাবু তাকে অনুরোধ উপরোধ করে বসিয়ে চা বিস্কুট খাইয়ে আপ্যায়িত

করে আফিসের বর্তমান অবস্থার কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এবং বিপিনবাবুকে কোথায় পোস্টেড্ করবে জেনে নিতে চাইলেন।

তা ছোকরা একটু হাঁদা প্যাটার্নের, অফিসে নিজের ফাইলটি ছাড়া কিছুই খবর রাখে না। তবে বিপিনবাবুর ব্যাপারে জানালো, 'তিনি যদি হেড আফিসে থাকতে চান তো কলকাতাতেই থাকতে পারবেন, আর যদি বাইরে যেতে রাজী থাকেন তো ওঁর ইচ্ছে অনুযায়ী যে কোনো জায়গায়—'

বড়কাকা কথাটা ওর শেষ করতে দেন না, প্রায় থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'যেতে রাজী থাকবো না মানে? বাইরে থাকার মতো সুখ আছে? কলকাতায় যে পড়ে আছি ভাই, সে নেহাৎ বাধ্য হয়ে! নইলে কলকাতায় আবার মানুষ থাকে? ছি ছি! এ কী আবার একটা বসবাসের জায়গা?'

তা' ভাইপোর কাছেও সেই কথাই বলেন বিপিনবাবু।

বলেন, 'ছি ছি! কলকাতায় আবার মানুষে থাকে? এটা কী আবার একটা বসবাসের জায়গা?'

সুশীলবাবু অবশ্য এই জোর ঘোষণায় কিঞ্চিৎ মলিন হন। আস্তে বলেন, 'তা বড়কাকা, তোমার বাবা জ্যাঠা তো এইখানেই বাড়ি বানিয়েছিল, নইলে আর আমরা—'

বড়কাকা কিছুমাত্র না দমে জোরালো গলায় বলেন, 'সে কথা বাদ দাও। সে ছিল সোনার কলকাতা। তখন কলকাতায় কড়ি ফেললে অধেক রাত্রে বাঘের দুধ মিলতো। সে তোমাদের এই পচা কলকাতা নয়। এখনকার এই কলকাতায় আছে কি? থাকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই সিনেমা থিয়েটার, আর জামা জুতো সাবান পাউডার গয়না কাপড়! বলি আর কি? বাঘের দুধ তো দূরের কথা, সত্যিকার গরুর দুধই মেলে না। বল, মেলে একফোঁটা? সত্যিকার ঘি? সত্যিকার সরষের তেল? লবডঙ্কা! সব ভেজাল। পেটে ভেজালের জাল

বিছিয়ে, শাড়ি পরো, গাড়ি চড়ো ব্যাস্! নাঃ বাপু, আমি বলে দেব, আমার হেড্ আফিসে দরকার নেই। অন্য যেখানে হোক—'

আফিস থেকে আসা সেই ছোকরা চলে যাবার পর প্রথমটা বড়কাকা কাউকে কিছু বলবো না ভেবেই দোতলায় এসে কাগজখানা খুলে মুখের সামনে মেলে ধরেছিলেন।

কিন্তু অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটলো।

কাগজের অক্ষরগুলো কিছুই যেন বুঝতে পারলেন না, শুধু কালো কালো কতকগুলো রেখা চোখের সামনে নড়তে লাগলো, বেড়াতে লাগলো, নাচতে লাগলো।

ইংরিজি অক্ষর কি ভুলে গেলেন বড়কাকা? দ্বিতীয় বার আবার আফিসে জয়েন করবার এই পূর্ব মুহূর্তে। অথচ ভালো ইংরিজি জানা বলে আফিসে তাঁর একটা খ্যাতি ছিল তখন।

বাইরে বাইরে যারা কাজ করতে যেতো মানে তাঁর ওই 'পি. ডব্লু. ডি'র আফিসে, বিদ্যেসাধ্যির বালাই তাদের কমই থাকতো। বিপিনবাবুই ছিলেন শিক্ষিত ব্যক্তি। বিশেষ করে সাহেব সুবোর সঙ্গে কথা বলতে আর কেউ এগোতে চাইতো না, লেলিয়ে দিতো বিপিনদাকেই। বিপিনদাও সেই সব সাহেব টাহেবকে—ইংরিজির তোড়ে ভাসিয়ে দিতেন।

নিন্দুকেরা অবশ্য বলতো, 'সাহেবরা বিপিনদার ইংরিজি শুনে হাসে।'

সে কথায় কর্ণপাতও করতেন না বিপিনবাবু।

নেহাৎ কানে ঢুকে এলে বলতেন 'হাসে তো হাসে। তাতে লজ্জা পাবার কী আছে? লজ্জা পাবার কী আছে? ইংরিজি আমার মাতৃভাষা? হ্যাঁ, মাতৃভাষায় ভুল হলে লজ্জার কথা। একটা বিদেশী ভাষা, পরের ভাষা তাতে ভুল থাকবে এতে আর আশ্চর্য কি! কাজ চালিয়ে দিতে পারছি এই ঢের। বলি সাহেবরা যখন ব্যাকরণের পিণ্ডি চটকে উচ্চারণের মুণ্ডুপাত করে বাংলা কথা বলে? তখন কি

হয়? ···লজ্জা পায় তারা? না কি—আমরাই হাসতে বসি? হাসা তো দূরের কথা বরং ওদের মুখে দুধে খোকার মতো আধো-আধো বাংলা শুনলেই মোহিত হই। বলি, আহা! আহা! কী অসাধারণ ক্ষমতা! বাংলা বলছে। হুঁঃ। হাসে। হাসে তো—ঘরের ভাত বেশী করে খাক। তবে হ্যাঁ, আমার সামনে একবার হাসতে আসুক দিকি? দাঁতের জিওগ্রাফী বদলে দেবো। সোজা তার নাকের সামনে পা তুলে বসে বাংলায় যত রাজ্যের সব বিদ্‌ঘুটে প্রশ্ন করবো আর ভুল-টুল উত্তুর দিলেই ভেঙিয়ে হাসবো। তাতে যদি লজ্জা পায় ঠিক আছে। কিন্তু যদি ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই করতে আসে তবে ওই যা বললাম, দাঁতের জিওগ্রাফী বদলে দেবো।'

বড়কাকার বড় নাতি মানে নাতবৌয়ের বর সমীর এ গল্প শুনে বলেছিল, 'কিন্তু দাদু, বরাবর তো শুনেছি আপনার খুব সাহেব প্রীতি ছিল।'

বিপিনবাবু জোর দিয়ে বলেছেন, 'অস্বীকার করছি না। ছিল প্রীতি। যাদের রীতি-নীতি ছিল মানুষের মতো তাদের প্রতি প্রীতি ছিল। ···আমার সাফ কথা হচ্ছে ভালোবাসবো মানুষকে। তা সে এই ভুমণ্ডলের যে মণ্ডলেই জন্মাক। অমানুষ হলে? সহোদর ভাইও বিরক্তিকর, বুঝলে? এই হচ্ছে তোমাদের কাকাদাদুর সাফ বাত।'

এমন সব সাহেব দেখেছি যারা আমায় বিপিনদা' বলে ডাকতো, চেয়ে চেয়ে পান খেতো আর ওপরওলা হয়েও নম্র হয়ে কাজ শিখতো। কাজ তো কম জায়গায় করিনি। এ ডিপার্টমেন্ট থেকে ও ডিপার্টমেন্ট, ঢের জায়গায় ঘুরিয়েছে। তোমাদের এই স্বাধীনতার পরও কম দিন কাজ করিনি। বাঙালী সাহেবদেরও দেখলাম।'

বড়কাকা উত্তেজিত হয়ে বলেছেন, 'দেখলাম রোদের থেকে বালির তাত বেশী। ভুল করে মরলেও মান খুইয়ে বলবে না, তাই তো, ভুল হয়ে গেছে। নিজের অহঙ্কার বজায় রাখতে সে ভুলকেই জোর করে চালাবে।'

অফিসের কথা উঠলে, অথবা একাল সেকালের তুলনা উঠলেই বড়কাকা এমন উত্তেজিত হয়ে যান যে, খানিক পরে ফ্রীজের জল বার করে মাথায় থাবড়াতে হয়।

তবু আজকের উত্তেজনার কাছে কোনোদিনের কোনো উত্তেজনাই দাঁড়াতে পারবে না। খবরের কাগজের লাইন তো দূরস্থান সারা পৃথিবীই তো নড়ছে, নাচছে।

এ সময় কারো সঙ্গে কথা বলা শক্ত।

বড়কাকা অতএব কাগজখানা জোর করে সামনে ধরে রেখে ভাবতে থাকেন কী নামে ডাকতাম ঈশানকে?

পালোয়ান?

নাঃ, সে তো নিখিল নন্দীকে।

ভোম্বোল? সে তো অজিত বিশ্বাসকে।

সৃষ্টিধর? সে তো ষষ্ঠিচরণকে।

ঘটোৎকচ? বিষ্টিনাথের পাঁ্যাড়া? কাশীর চমচম? দুধ-সাবু?

উঁহু! এদের সকলের নামই তো মনে আছে। পর পর ভাবতে থাকেন বড়কাকা, সত্যশরণ, রজনীরাজ, রামদুলাল, সুধাময়!

এরা কেউ নয়।

তবে কে?

আর কাকে কোন অদ্ভুত নামে ডাকতেন বিপিনবাবু?

যে লোক সর্বদা তাঁর নাম করে।

তাঁর হাতের রান্না এখনো ভুলতে পারে না।

তবে কে? তবে কে?

হঠাৎ বিদ্যুৎ বিকাশের মতো একটা কথা মনে পড়ে যায়।

তবে কি সেই ঈগল পাখী?

তাই হবে। তাই সম্ভব। তীক্ষ্ণ নাকের জন্যে তাকে ঈগল পাখী বলে ডাকতেন বিপিনবাবু, ভালো নাম মনেও নেই। বোধ করি ওই ঈগলের মধ্যে ঈশানের দীর্ঘ ঈটা রয়ে গিয়েছিল বলেই নামটা ভুলে

গিয়েছিলেন।

ঈগল পাখীর চেহারাটা মনে পড়ে গেল।

হায়! হায়! আর একটু আগে যদি মনে পড়তো! ছোকরাকে তাক্ লাগিয়ে দিয়ে বলতে পারতাম, 'মনে আবার নেই? নাকটি সেই রকমই আছে তো? আর কানের কাছে সেই আঁচিল?'

ওই আঁচিল-টাঁচিল ভাবতে ভাবতে দিশেহারা ভাবটা একটু কমলো বড়কাকার। হঠাৎ ভাবলেন, সেই সুশীল এলে তবে বলবো তার আগে বৌমাকে পর্যন্ত বলবো না, কিন্তু এটা কি ভাল দেখাবে?

ভাবেন ভাল দেখাবে।

তখন হাঁক পাড়েন, 'বৌমা, বৌমা!'

বৌমা আসেন।

বড়কাকা খুব সহজ গলায় বলেন, 'এই যে তোমার কাজকর্ম মিটলো? ভাবলাম কাজের সময় আর ডেকে হেঁকে ব্যস্ত করবো না। তাই এতক্ষণ—মিটেছে তো কাজ?'

বৌমা অনুযোগের গলায় বলেন, 'আমার আবার কাজ মেটা; এ জীবনে নয়।'

বড়কাকা উৎসাহিত হয়ে উঠেন।

বড়কাকা যেন একটা 'ধরতাই' পান।

সমবেদনা সমবেদনা গলা করে বলে ওঠেন বড়কাকা, 'তা যা বলেছো বৌমা। 'কাজ-কপালে' লোকেদের ওই দশাই ঘটে। এই আমারই দেখো না। আজ সকালে অফিস থেকে একটা ছেলে এসে ছিল—শুনেছিলে নাকি?

বৌমা আস্তে মাথা নাড়েন।

'ওঃ শোনোনি। শুনবেই বা কোথা থেকে? বড়কাকা খুব শান্তভাবে বলেন, 'তখন তো তোমরা সবাই ব্যস্ত। শুধু নাতবৌমা, তা নাতবৌমা তো কলেজেই চলে গেল। হ্যাঁ, কি বলছিলাম? ওই কাজ? ......বলে কিনা আবার কাজ করতে হবে। ...এই যে চিঠি—'

বড়কাকার গায়ে তখনো শার্টটি পরাই ছিল। বড়কাকা তাঁর পকেট থেকে চিঠিটি বার করে একটু হেসে বলেন, ‘বিপিনবাবু বিহনে না কি ওনাদের অফিস অচল হয়ে যাচ্ছে। অতএব ওঠো বিপিনবাবু আরামের শয্যে ছেড়ে। ছোট নিজেকে কাজের চাকায় জুড়তে। ……তাই বলছি।—’

বৌমা আকাশ থেকে পড়েন।

অবাক গলায় বলেন, ‘ওমা, এতোদিন রিটায়ার করার পর আবার কাজ করতে বলছে?’

বড়কাকা মৃদু গুঞ্জরণে হেসে বলেন, ‘তবে আর বলছি কি? এইসব মানুষকেই বলে ‘কাজ-কপালে’। বিশ্রাম এদের সয় না।’

মুখ চোখ খুবই মলিন করতে চেষ্টা করেন বড়কাকা। কিন্তু সফল হল না। আরো জ্বলে জ্বলে ওঠে।

বৌমা কিন্তু রীতিমত মলিন হন।

শঙ্কিতও।



‘আপনি কি সত্যি আবার চাকরি করবেন না কী বড়কাকা?’

বড়কাকা অবোধকে বোঝাবার ভঙ্গীতে বলেন, ‘আবার চাকরি বলতে তো কিছু নেই বৌমা! সেই চাকরিই। শুধু মাঝে কিছুদিন

গ্যাপ্ গেছে এই যা।'

বৌমা এবার যেন ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে 'জট নড়ে তেঁতুল পড়ে'র ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বলেন, 'না না, এ হতেই পারে না বড়কাকা, সারা-জীবন খেটে খেটে ক্লান্ত হয়ে, এখন একটু বিশ্রামের জীবন পেয়েছেন, আবার? আপনি কথা-টথা দিয়ে বসেননি তো?'

বৌমার এই সজোর আপত্তিতে রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যায় বড়কাকার। মনে মনে ভাবেন, আহা, কী হিতৈষীই এলেন আমার! এ হতেই পারেনা। ওহে মা জননী, সারাজীবন কাজ করে করে ক্লান্ত এ শর্মা মোটেই হয়নি। এখন ক্লান্ত হচ্ছে কিছু না করে করে। প্রথম প্রথম একটু ভালো লেগেছিল, এখন তো অসহ্য লাগছে। বিশ্রামের জীবন পেয়েছি। আহা! তোমরা রাতদিন সবাই কাজের পেছনে ছুটবে। আর আমি বসে বসে কার্নিশের চড়াই পাখি গুনবো, এইতো জীবন! একে জীবন বলে? ভগবান আমায় আবার মানুষের দরে ফেলছে, আরঃতুমি এসেছো ফোফোর-দালালি করতে! হুঃ!

মুখে অবশ্য এসব কথা প্রকাশ করে ফেলেন না বড়কাকা। শুধু উদাস অথচ নিশ্চিত গলায় বলেন, 'ওর আর কথা দেওয়া দেয়ই কী বৌমা? কথা না নিয়ে ওরা ছাড়বে? আর আমিই-বা পুরনো মনিবের দরকারের সময় 'নেহি পারেঙ্গা' বলে বসে থাকবো কী করে? না, ওর আর ছাড়ান-ছোড়ন নেই।'

বৌমা তবু নাছোড়!

বলে উঠেন, 'তা এটা তো একটা জুলুম? আপনি রিটায়ার করে বাড়ি বসে আছেন, আর ওরা কিনা খুঁজে খুঁজে ঠিকানা জোগাড় করে—'

'সেই তো!'

বড়কাকা একটু আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন।

'তখনও তো এই একই অবস্থা। যেখানে জল পড়ছে, সেখানেই গিয়ে ছাতি ধরুক এই বিপিনবাবু।......যেখানে যতো গোলমেলে

রাস্তা, যতো পাণ্ডববর্জিত দেশ, সেখানেই ঠ্যালে বিপিনবাবুকে। তখনও বোধ হয়—'

বড়কাকা একটু উচ্ছ্বাসের হাসি হেসে বলেন, 'বোধহয় ইয়াং-ম্যানেরা গোলমেলে জায়গায় যেতে চাইছে না। তাই এই বৃদ্ধকে—'

বৌমা তথাপি শেষ হাল ধরেন।

বলেন, 'তাই বলেই তাই করবেন আপনি? অসম্ভব! সোজা বলে দিন হেড্ আফিসে রাখো তো রাখো, নচেৎ—'

বড়কাকা অসহিষ্ণু গলায় বলেন, 'আমার কাছে হেড্ টেল্ সবই সমান বৌমা! কলকাতা থেকে বরং বাইরেই ভালো। খোলা-মেলা—'

বৌমার কাছে আর কলকাতার ব্যাখ্যানা করতে সাহস হয় না।

তাই বলেন, 'ভালো! খোলামেলা।'

মনে মনে বলেন, বাবা! এই বন্দীশালা থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। কতোই যেন শুভানুধ্যায়ী, তাই যাতে আমার ভালো, সেটাই ধ্বংস করতে আসছেন।

বড়কাকা তাড়াতাড়ি বলেন, 'দেখি সুশীল কী বলে?'

অর্থাৎ এইখানেই আলোচনায় ইতি টানলেন।

মানে জানেন, সুশীল যাই বলুক, আমার ইচ্ছে আমি প্রকাশ করবোই।

উঃ, কেবলি ইচ্ছে হচ্ছে এক্ষুনি কোথাও ছুটে চলে যাই, তা নয় এখন উনি হিতকথা বলতে এলেন, বাইরে যেও না। কলকাতা ছেড়ে যেও না। চললাম তোমার কথা শুনতে!

যাক্ একটি পাকা কথা বলা হয়েছে সুশীল আসুক, কী বলে।

আর কথাটি কইতে পারবেন না বৌমা।

পারেনও না।

উঠে চলে যান।

শুধু যাবার সময় বলে যান, 'দেখবেন আপনার ভাইপো, নাতিরা,

কেউ রাজী হবে না।'

এবার বড়কাকা চটে যান।

প্রায় কড়া গলায় বলে ওঠেন, 'ওসব আবদেরে কথা বললে তো চলবে না বৌমা! আফিস বলে কথা।······তাছাড়া চিরকালের অন্নদাতা। মানুষের শরীরে কৃতজ্ঞতা বলে একটা জিনিস আছে তো? না কি নেই?'

বৌমা চলে গেলে বড়কাকা রাগরাগ মুখে আবার খবরের কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরেন।

বলা বাহুল্য রেজাল্ট একই হয়।

অক্ষরগুলোর আলাদা কোনো অবয়ব খুঁজে পান না। শুধু যেন একসার পিঁপড়ে।

বড়কাকার ভয় ভয় লাগে।

চোখটা কী হঠাৎ এতো খারাপ হয়ে গেল? না ইংরিজি ভুলে গেলেন?

ইংরিজিটা ফেলে বাংলা কাগজটা তুলে নেন।

ফল সেই একই।

তার মানে চাঞ্চল্য।

বড়কাকা এবার নিজেই রোগ নির্ণয় করেন। অতএব সরিয়ে রাখেন কাগজ।

শুধুই আকাশের দিকে তাকিয়ে রাগরাগ মুখে ভাবতে থাকেন, যা দেখছি—এদের কবলমুক্ত হতে বেগ পেতে হবে। বাড়ির গিন্নীই যখন উল্টো গাইছেন।

কেন রে বাপু! আমার জন্যে তোদের এতো দরদ কিসের? বুড়োটার সঙ্গে দু'টো কথা বলবারও তো সময় নেই। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে সেই কবে যেন একদিন একটু কান দিয়েছিলে তোমরা। ······কতো ভালো লাগলো সেইসব পুরনো কথা কইতে। ব্যাস্ হয়ে গেল!

আর কি ?

কাকস্য পরিবেদনা !

নাঃ, আমাকে শক্ত হতে হবে। তা শক্তই হল বড়কাকা।

একটু পরেই যখন কৃষ্ণা আর চিত্রা দুই নাতনী নাচতে নাচতে এসে বলে, 'কাকুদাদু, আপনি না কি আবার চাকরিতে জয়েন করবেন ?'

তখন গম্ভীর ভাবে বলে, 'তাতে মহারাণীদের কোনো লোকসান আছে ?'

ওরা সমস্বরে বলে ওঠে, 'নেই ? বাঃ, আপনি বুড়োমানুষ, এখন কোথায়—'

বড়কাকা ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, 'হয়েছে হয়েছে! খুব ডেপোমি হয়েছে। যাও দিকিনি নিজেদের চরকায় তেল দাও গে।'

কৃষ্ণা বলে ওঠে, 'তাই তো দিতে এসেছি। আপনি বুঝি আমাদের নিজের চরকা নন ?'

বড়কাকা এই বাচাল মেয়ে দুটোর দিকে একবার তীব্র দৃষ্টিপাত করে বারান্দা থেকে উঠে পড়ে গট গট করে ঘরের মধ্যে চলে যান।

কিন্তু তাতেই কি রক্ষে আছে ?

নাতনীদের ওপর নাতবৌ নেই ? যাকে বেশী কিছু বলাও যাবে না।

কজে থেকে ফিরেই তো তিনি এসে হাজির।

'কাকুদাদু, তারপর কী হলো ? আমি তো তাড়াতাড়ি কলেজ চলে গেলাম। আপনি কী বললেন সেই ভদ্রলোককে ?'

বড়কাকা গম্ভীর হাস্যে বলেন, 'ভদ্রলোককে আর কি বলবো ? ভদ্রলোকের মতো কথাই বললাম।'

'ওঃ, বাঁচলাম।' নাতবৌ অলৌকিক সরলতা মুখে মেখে বলে, 'ভাগ্যিস্ ! আমার যা ভয় হয়েছিল, ভুলিয়ে ভালিয়ে শেষ পর্যন্ত না আপনার মত আদায় করে নিয়ে যায়।'

বড়কাকার আপাদমস্তক জ্বলে যায়। মনে মনে বলেন। ওঃ! খুব যে !

মত না দেওয়াটাই তাহলে ভদ্রতা ছিল ?

বলি হঠাৎ এই বুড়োটার জন্যে সবাইয়ের দরদ এত উথলে উঠেছে কেন ?···হুঁ বাবা ! ভাবতে বেকার বুড়ো বসে আছে, বকবক করে মরছে, ওটা একটা ফালতু ! হঠাৎ যেই দেখলে এ কী রে বাবা ! এরও যে দেখছি দর আছে, কদর আছে, অমনি বুড়োর জন্যে মায়া ধরছে না।

বাঁচলাম। আমি সেই বেকার হয়ে বাড়ি বসে থাকলেই বাঁচবে তুমি। আহ্লাদ। রোসো, কালই বাক্স স্যুটকেশ গুছিয়ে ফেলছি।

বাক্স স্যুটকেসের কথা ভাবতে ভাবতে জামা কাপড়ের সংখ্যার কথা ভাবতে বসেন বড়কাকা। কিছুই নেই প্রায়। রিটায়ার করে পর্যন্ত কোট তো করানোই হয়নি। জুতোও চলছে কতোদিন ধরে।

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা কিছু তুলে ফেলে বেশ কয়েকটা জামা জুতো করে নিতে হবে। ভাবতে ভাবতে আবার চলে যান অন্য জগতে।

আচ্ছা যদি বলে, বিপিনবাবু আপনি কোথায় থাকতে চান ? কলকাতায় ? নিশ্চয়ই সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়বো আমি। বলবো উঁহু বাইরে বাইরে।

কোথায় ?

যেখানে হোক।

তবে সুলতানগঞ্জে হলেও মন্দ হয় না। সেইখান থেকেই তো কর্মজগতে ইতি হয়েছিল।

আচ্ছা রমেশ সরকার কি এখনো আছে সেখানে ? আর লছমন পিয়ন ? রামহরিটা কার কাছে কাজ করছে কে জানে ! তখন অবশ্য বলেছিল, আপনি চলে যাচ্ছেন বাবু, রামহরিরও এই শেষ। দেশে চলে যাবো, চাষবাস করবো। তা সত্যিই কি আর তাই করেছে ? গরীব মানুষ। টাকার কতো দরকার···তাছাড়া—বড়কাকা একটু হাসেন, শুধু কি টাকার দরকারেই কাজ ? কাজের দরকারে নয় ? এই তো আমার ? টাকার কী এমন দরকার ? ব্যাঙ্কে যা আছে, বাকী জীবনটা শুধু খেয়ে-পরে চলেই যায়। কিন্তু—

আর একটু হাসলেন।

কিন্তু আবার কাজ করবো ভেবে মন এমন নেচে উঠছে কেন ?

আবার চিন্তায় ছেদ পড়লো।

সুবল এলো। সঙ্গে ফুটবল।

ফুটবল তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠে বললো, 'কাকুদাদু, আজ সকালে তোমার কাছে একটা ঝাঁকড়া চুলো লোক আসেনি? বলেনি তোমায় আবার চাকরি করতে হবে, ছোটদা বিশ্বাস করছে না। বলছে বাজে কথা।'

বড়কাকাও সমান ওজনে চেঁচিয়ে বলেন, 'লোকটা মানে? ঝাঁকড়া চুলো মানে? ঝাঁকড়া চুলো মানে কি? কথাবার্তা কী হচ্ছে? ভালো ইস্কুলে পড়ার এই শিক্ষা? কেন, কোঁকড়া চুল ভদ্রলোক, বলতে পারো না? বিশ্বশুদ্ধু লোকের তোমার মতন কদমছাঁট হবে, না? যাও চলে যাও।'

'ওরে বাবা, বুড়ো ক্ষেপেছে,' বলে ডিগবাজি খেতে খেতে পালায় ফুটবল।

সুবল জাঁকিয়ে বসে।

বলে, 'আচ্ছা কাকুদাদু, দাসত্ব জিনিসটা কি এতোই মিষ্টি?'

বড়কাকা উত্তর দেন না।

সুবল আবার বলে, 'কথায় বলে, 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়! দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরে গলায় রে, কে পরে গলায়।' অথচ আপনি খুলে ফেলে দেওয়া শৃঙ্খলটি ইচ্ছে করে আবার তুলে নিয়ে গলায় পরতে চাইছেন?'

বড়কাকা ভীষণ গলায় বলেন, 'তোমার বুঝি আজ পড়ালেখা নেই?'

'আছে। কিন্তু খবরটা শুনে—'

'কি হলো, খবরটা শুনে বুক ফেটে গেল কেমন?'

বড়কাকা খিঁচিয়ে ওঠেন, 'দাসত্ব যদি এতোই খারাপ তো বেকার ছোঁড়াগুলো মনের আগুনে জ্বলে জ্বলে সর্বত্র আগুন জ্বালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন হে ইয়ার ছোকরা? স্বদেশের দাসত্বেও মন উঠছে না, আমেরিকায় ছুটছে, জার্মানীতে ছুটছে, ওই দাসত্ব শৃঙ্খলটি গলায় পরবার জন্যে,

দেখছো না বুঝি ?'

সুবল বলে, 'আহা, তাদের তো অভাব। আপনার তো আর তা নয় !'

বড়কাকা ক্রুদ্ধ মুখে বলেন, 'আমার হচ্ছে স্বভাব। হলো তো ? এসেছে একটা শুভ প্রস্তাব, বাড়িশুদ্ধু সবাই দাঁড়কাকের ডাক ডাকতে এলো। যাও যাও ভেগে পড়ো।'

কিন্তু সুবলেই কি শেষ হলো ?

সমীর নেই ? বড় নাতি ? নাতবৌমার বর ?

সে তার আফিস থেকে ফিরেই আর কোনো কথাবার্তা নেই সোজা এখানে। যে দুর্লভ সৌভাগ্য বড়কাকার জীবনেও হয় না।

তার গলা উদাত্ত। তার ভঙ্গী ব্যাঙ্গাত্মক।

'কাকুদাদু, শুনলাম নাকি আপনার অভাবে আপনার পি. ডব্লু. ডি. আফিস অচল হয়ে বসে আছে। আপনি গিয়ে হাত না লাগালে চলবে না ?'

বড়কাকা কিছুক্ষণ আগেই স্থির করে রেখেছিলেন, আর কারো কোনো কথাতেই উত্তেজিত হবেন না, কিন্তু এমন হাড় জ্বালানো কথায় কে উত্তেজিত না হয়ে পারে ? বড়কাকা তো অন্ততঃ পারেন না।

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'বড্ড হিংসে হচ্ছে না ? ভাবছো এই একটা বুড়ো হাবড়া বেকার তার আবার এতো দর যে ডেকে নিয়ে গিয়ে আবার চেয়ারে বসায়। কেমন ?'

সমীর হো হো করে হেসে উঠে বলে, 'নাঃ, অতোদূর নয়। ভাবলাম, এই বৃদ্ধ বয়সে আবার কেন পরের দাসত্ব ! বেশ তো আছেন ! তা আপনি তো দেখছি বদ্ধপরিকর।'

'হ্যাঁ ! বদ্ধপরিকর। হলো ?'

বলে বড়কাকা তাঁর সুটকেশটা বিছানার উপর বসিয়ে তার ভিতরের জিনিসপত্র বার করতে থাকেন।

অর্থাৎ একেবারে প্রস্তুতিপর্ব।

একটু আগেই পুরান ঝি শশী, আর বামুন ঠাকুর বিপিন দাদা-

মশাইয়ের পুনঃ চাকরিপ্রাপ্তি সংবাদে বিস্ময় প্রকাশ করে গেছে। এবং তাড়া খেয়েছে।

তারপরই বড়কাকা স্যুটকেস নিয়ে পড়েছেন!

কাল বাদ পরশু দেখা করতে বলেছে।

অতএব হাতে মাত্র একটা দিনই সময়, কে বলতে পারে পরদিনই জয়েন করতে বলবে কিনা!

এরা এমন করছে যে রাগ ধরে যাচ্ছে।

বেকার লোকটার একটা চাকরি হয়েছে, কোথায় আহ্লাদ প্রকাশ করবি তা নয় কেবল উল্টো গাইতে বসেছে। তবু এখনো আমার ভ্রাতুস্পুত্রই বা কি ভাববেন? বড়কাকার তার জন্যেই একটু ভয়। হয়তো অভিমান করবে। যাক গে সে আবার বুঝমানও আছে। বুঝবে একটা মানুষের শুধু বসে থাকা কী কষ্টকর। লোকদের তবু নিজের নাতিপুতি থাকে, বিপিনবাবুর কি তাও আছে ছাই!

নাঃ।

কথায় আর ভিজছেন না বিপিনবাবু।

রেলগাড়ীর কামরা যেন শতবাহু মেলে ডাকছে তাঁকে।

স্যুটকেসটার কলকব্জা ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে নেন।

আছে, সব ঠিক আছে।

সুশীলবাবু একটু রাত করেই ফেরেন।

আফিস ফেরৎ আরও একটা কাজ করেন পার্ট টাইমে।

ফিরে এসেই ঘটনাটা বামুন ঠাকুর আর শশীর কাছে শুনলেন নিচতলা থেকেই।

শুনে অবাক হলেন।

বিষণ্ণও হলেন।

ওপরে গিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'তুমি তাহলে একেবারে ঠিক করেই ফেলেছ?'

বড়কাকা তাড়াতাড়ি জামা পাট করতে করতে বলেন, 'এর আর ঠিক করাকরি কি? যা করবার তারাই করে পাঠিয়েছে।'

'তা আমি বলছিলাম কি নেহাৎই যদি কাজ করো হেড্ অফিসেই, মানে কলকাতাতেই করো। বাড়ির মানুষ বাড়িতেই থাকবে, কাজ-কর্ম করে মনটাও ভাল থাকবে।'

বড়কাকা আর পারলেন না। উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, 'কলকাতায়? কলকাতা কী একটা মানুষের বসবাস যোগ্য জায়গা?'

নাঃ। ওসব মায়ার ছলনায় ভুলবেন না বড়কাকা। মন শক্ত করতে হবে।

এই যে: একটু আগে সুশীলচন্দ্র বলছিলেন, কি হবে বড়কাকা আবার ওইসব ঝামেলায়? আর গোটা তিনেক বছর পরে তো আমিও রিটায়ার করবো। তখন কাকা ভাইপোতে বসে বসে দাবা খেলা যাবে,—

তখন কি হঠাৎ চোখে জল এসে যায়নি বড়কাকার?

এসেছিল।

তবু তিনি মন শক্ত করেছেন।

'বিপিনদা' ডাকটার জন্যে প্রাণ যেন আনচান করছে।

আর একটা দিন।

আর একটা রাত।

আর একটিও রাত, একটিও দিন নেই।

স্রেফ্ কয়েকটি ঘণ্টা মাত্র।

যদিও বেলা দশটায় দেখা করবার কথা, বড়কাকা তবু শেষ রাত্রেই উঠে বসে আছেন। এবং মনে মনে ভাবছেন, আজ আর কারো সঙ্গে কথা কাটাকাটি নয়।

আজ শুধু ভাল কথা।

আজ শুধু ভগবানের নাম।

আজ থেকে আবার তাঁর সেই হাস্যোজ্জ্বল বিপিনদা মূর্তি। সত্যি মেজাজটা বড় খারাপ হয়ে গেছে।

ওদিকে বিপিনদার নাতি নাতনীর মধ্যে এক গোপন বৈঠক বসে

গেছে। বড় নাতি, মেজ নাতি, নাতবৌ, নাতনীরা।

তাদের চাপা কথাবার্তার মধ্যে দু-এক টুক্‌রো মাত্র শোনা যাচ্ছে।

'সব ঠিক আছে?'

'সব ঠিক।'

'বাবার কানে না যায়!'

'উঁহু! রীতিমত ইয়ে করে কাজ হয়েছে।'

'ছবির সেই চুলটা?'

'আছে?'

'বুশশার্ট, ট্রাউজার?'

'আছে।'

'সব ডিরেক্‌শান দেওয়া আছে?'

'আছে।'।

'মা কেমন ভাব করছেন দেখছিস?'

'দেখছি। যেন কিছু জানেন না।'

'হুঁ বাবা! সবাই চালাক।'

'কর্তার সাজগোজ হয়ে গেছে?'

'গেছে বলেই মনে হচ্ছে।'

'ও বুড়ো ঠিক সাড়ে আটটার সময়ই বেরিয়ে পড়বে। যা ব্যস্ততা!'

'পড়লেই ভালো। বাবার আগে বেরিয়ে গেলেই—'

'কে রে ওখানে? ফুটবল? তুই এখানে কি করছিস?'

ফুটবল গম্ভীর ভাবে বলে, 'কি আবার করবো! দেখতে পাচ্ছো না লাটাইতে সূতো জড়াচ্ছি।'

'সূতো জড়াচ্ছি! সূতো জড়াবার আর জায়গা পাওনি না? ...যা পালা! পালা এ ঘর থেকে।'

'না যাবো না।'

'যাবি না?'

'নাঃ, কেন যাবো? এই ঘরটা কি তোমাদের কেনা নাকি?'

'কী কী বললি? ভালো চাস তো যা বলছি। নইলে চাঁটি মেরে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব।'

'ইঃ! চাঁটি মেরে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবেন। ভারী মজা!'

নাঃ! এতো ঔদ্ধত্য অসহ্য!

ঠাস্ করে একটা শব্দ হয় সেই জানলা দরজা বন্ধ অন্ধকার অন্ধকার ঘরটায়।

সঙ্গে সঙ্গে ফুটবলের পরিত্রাহী গলা, 'দেখো ছোড়দা ভাল হবে না বলছি, মারা হলো! দাদা বলে মাথা কিনেছেন। আচ্ছা, দেখাচ্ছি মজা।'

'সেরেছে!'

'এখন এই মোক্ষম সময় চেঁচামেচি বাধালো রে! তোরও যেমন! মারতে গেলি কেন?'

'না মারবে না। কী রকম অসভ্য হয়ে যাচ্ছে দেখলে না?'

'দেখলাম তো! কিন্তু ঠিক এই সময়—হুঁ।'

'এই ফুটবল, ফুটবল।'

ফুটবলের পিছনে ধাবিত হয় সুবল। 'গাধার মতো চেঁচাছিস কেন?'

'না চেঁচাবে না। নিজে মারবেন।'

'আচ্ছা যথেষ্ট হয়েছে। রাগিস কেন? আচ্ছা, এখন তো তুই ঘুড়ি ওড়াবি? যা এই টাকাটা নিয়ে ঘুড়ি কিনগে।'

'হুঁ—উ—উ। সব টাকাটা?'

'আচ্ছা যা। সব টাকাটাই।'

'ফুটবল একটু চোরা হাসি হেসে লাফাতে লাফাতে দোকানে চলে যায়।'

'ওদিকে বড়কাকার সাজগোজ সমাপ্ত। ঠাকুর প্রণামও হয়ে গেছে।

নাতবৌমা এসে বলেন, 'কাকুদাহু, ভালো করে কিছু খেয়ে গেলে হতো না? যদি দেরী টেরী হয়?'

'ভালো করে ছেড়ে, আজ বড়কাকার গলা দিয়ে পুরো পেয়ালা চা-টাই নামেনি। লুকিয়ে ফেলে দিয়েছেন।'

অতএব তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, 'কেন ? দেরী হতে যাবে কেন ? যাবো দেখা করবো, এই তো !'

'যদি আজ থেকেই কাজে লাগতে বলে ?'

সে ভয় যে বড়কাকারও ছিল না তা নয় তবু মনের জোর দেখিয়ে বলেন, 'পাগল ! চাকরি কি রাস্তায় পড়ে আছে নাতবৌমা ?···দেখা করবো, জিজ্ঞেসাবাদ করবে, আমাকে দিয়ে কাজ চলবে কি না বুঝবে, তবে তো ?'

যদিও এসব আশঙ্কা কিছুমাত্রই ছিল না বড়কাকার,—তবু লোক দেখিয়ে বলেন এসব।

সুশীলবাবু বলেন, 'আচ্ছা বড়কাকা আমি তবে এগোই ? তোমার তো সেই দশটার পর ?······'

বড়কাকা হাঁ হাঁ করে ওঠেন, আবার আগে পিছে কেন ? চলো না একসঙ্গেই বেরিয়ে পড়ি। যা তোমাদের বাসের অবস্থা একা যেতে ভরসাও হয় না। সাধে কি আর বাইরেই যেতে চাইবো ডিসাইড্ করে ফেলেছি ?'

'কিন্তু তুমি এতোক্ষণ আগে থেকে ?' সুশীলবাবু বলেন।

'তা হোক, তা হোক—'

বড়কাকা বলেন, আফিসে বসে না থেকে, বাইরে দ্বারোয়ানের কাছে বসে থাকবো।'

সুশীলবাবু একবার আপাদমস্তক দেখে নেন বড়কাকার।

সেই সাজ !

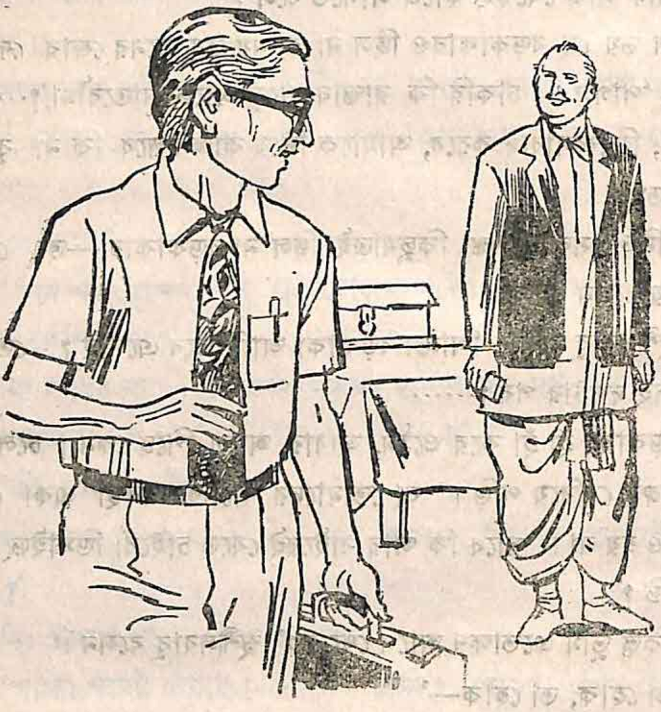
সেই ধুতির উপর পাট ভাঙা কোট, পায়ে ব্রাউন রঙের কেড্স, হাতে পানের কৌটো। এ বাড়িতে পান সাজা হয় না, বড়কাকা পানের দোকান থেকে পান কিনে নিয়ে কৌটো ভরে নেন। আজ সাত সকালেই ভরেছেন কৌটো।

দালানের দেওয়ালে সর্ববিধ ছবি। দেবদেবী থেকে সুরু করে

সিনেমা স্টার পর্যন্ত !

অর্থাৎ এটি বামুন ঠাকুরের অবদান।

বড়কাকা ওরই মধ্যে থেকে বেছে বেছে একে একে দ্বিতীয় দফা প্রণাম সেরে সবে ডাক দিয়েছেন, 'কইরে সুশীল ! চল।'



সেই মুহূর্তে ফুটবল একগোছা ঘুড়ি নিয়ে নাচতে নাচতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসে।

তারপরই হি হি করে হেসে বলে ওঠে, 'কাকুদাদুর আপিস যাওয়া হচ্ছে বুঝি ? হি হি হি আপিস !'

যদিও বড়কাকা সকাল থেকেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, আজ আর কারো সঙ্গে মনান্তর মতান্তর কথান্তর কিছু না, কিন্তু হতভাগা ছেলেটার ওই অকারণ হি হি দেখে আর মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন না।

'স্বভাব' বলে কথা।

যে না কি মলেও ছাড়ে না !

অতএব বড়কাকা প্রায় খিঁচিয়ে বলে ওঠেন, 'সক্কালবেলা এক ডজন ঘুড়ি কেন রে? কি করবি?'

'ঘুড়ি আবার কি করে মানুষ? খায়?' বলে ঘুড়িগুলো মাথার উপর তুলে একপাক নেচে নেয় ফুটবল।

সুশীলবাবু ছেলের এই অসভ্যতায় মর্মাহত না হয়ে পারেন না। এবং বকলে কোনো ফল হবে না জেনেও বকে ওঠেন, 'এ কী অসভ্যতা ফুটবল? ভালোভাবে কথা বলতে জানো না? সত্যিই এতো ঘুড়ি কেন? কে পয়সা দিলো?'

ফুটবল মিটিমিটি হেসে বলে, 'পয়সা? দিয়েছে ছোড়দা।'

'ছোড়দা! ও বাবা! হঠাৎ ভ্রাতৃস্নেহ উথলে উঠলো যে ছোড়দার। রাতদিন তো সাপে নেউলে। অঙ্ক ভালো করেছিলি বুঝি?'

বলে পরিস্থিতিটা মোলায়েম হলো ভেবে সুশীলবাবুও নিজের আফিসের ব্যাগটি বাগিয়ে ধরে সিঁড়ির দিকে এগোতে যান, কিন্তু ততক্ষণে ফুটবল পরিস্থিতিতে এক পোঁচ্ কালি লেপে বসে আছে।

'অঙ্কর জন্যে? অঙ্কর জন্যে টাকা দেবে ছোড়দা? হুঁঃ! ঘুষ দিয়েছে, ঘুষ! বুঝলে?'

'ঘুষ মানে?'

ফিরে দাঁড়ান সুশীলবাবু, 'ঘুষ মানে কি?'

যদিও ঘুষের টাকা পকেটস্থ করেছে ফুটবল তবু বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা নিয়ে বলে ওঠে।

'হি হি ওদের ষড়যন্ত্র শুনে ফেলেছি বলে।'

সুশীলবাবু এই বেয়াদব ছোট ছেলেটাকে এঁটে উঠতে পারেন না, তবু শাসন না করেও তো পারা যায় না। তাই কড়া গলায় বলেন, 'ষড়যন্ত্র মানে?'

'ওরে বাবা, বললে ওরা আমায় আস্ত রাখবে?'

বলে ফুটবল 'ওদের' ঘরের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে।

সুশীলবাবু আর কি বলতেন কে জানে, কিন্তু সে সময় আর একটি দুর্দান্ত ঘটনা ঘটে। ঠাকুর নিচে থেকে এসে খবর দেয়, 'দাদামশাই,

আপনাকে আফিস থেকে গাড়ি নিয়ে নিতে এসেছে।'

গাড়ি নিয়ে নিতে এসেছে!

আফিস থেকে।

বড়কাকার সিঁড়িতে নামতে উদ্যত কখন পা-দুটো সহসা মাটির সঙ্গে পুঁতে যায়। বড়কাকা সেই বিস্ময়ে প্রস্তরীভূত গলায় বলেন, 'কে এসেছে?'

'সেই যে কালকের বাবুটা। যে আপনাকে নাচিয়ে গেল।' বলে ঠাকুর ছুটে নেমে যায়, বোধকরি ডাল পোড়ার গন্ধে।

বড়কাকা হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন, 'দেখলে তো সুশীল? দেখলে তো? তোমাদের সব তাতেই গয়ং গচ্ছ। বলছি আজ কথাবার্তা বলবার জন্যে ডেকেছে। ঠিক আছে তুমি বসে বসে দেরী করো। আমি যাচ্ছি। ইশ্! নিতে চলে এলো—'

বড়কাকা তাড়াতাড়ি নামতে যান।

কিন্তু ফুটবলের দুর্মতি এই পরিস্থিতির ওপর দুম্ করে একটি হাতুড়ি বসিয়ে দেয়।

'আপিসের বাবু? হি হি! কী 'বাবু'রে! ঝাঁকড়া চুল পরা মেয়েমানুষ বাবু!'

কী আশ্চর্য! পাগল হয়ে গেল নাকি ছেলেটা!

'ফুটবল! ভেবেচিস কী তুই? যা খুশী বলবি?'

সুশীল বাবু রাগে দিশেহারা হয়ে তেড়ে গিয়ে ছেলেকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে, ওর হাতের ঘুড়ির গোছাটা টেনে ছিঁড়ে ফর্দা ফাঁই করে দেন।

সত্যি। এতো অসভ্য হয়েছে! বাড়তে বাড়তে একেবারে চরমে উঠেছে। লজ্জায় মাথা কাটা যায় ছেলের ব্যবহারে।

কিন্তু এ যুগের ছেলেমেয়েকে শাসন করে শায়েস্তা করতে পেরে ওঠে কে? তোয়াজে যদিও-বা কাজ হয়, শাসনে তো অসম্ভব!

ঘুড়ির দুর্দশায় মরীয়া ফুটবল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকে, 'যা খুশী বৈ কি! মেয়েমানুষই তো, আপিসের বাবু না কাঁচকলা। ও

তো বৌদির মামাতো বোন নতুদি! ব্যাটাছেলে সেজে সমিতিতে থিয়েটার করে মেডেল পেয়েছে। তাইতো কাকুদাদুকে ঠকাতে ওকে আপিসের বাবু সাজিয়েছে।......'

'ফুটবল! ফুটবল!'

কৃষ্ণা চিত্রা নাতবৌ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আগুনে আঁচল চাপা দিতে চেষ্টা করে, 'ফুটবল, দেখে যা কী কাণ্ড! তোর খাতাটা—'

কিন্তু আঁচলে কি আগুন চাপা পড়ে?

ততক্ষণে তো ফুটবলের আক্রোশের গলা শেষ কথা বলে নিয়েছে। 'আফিস থেকে ডেকেছে না হাতি! স্রেফ্ মজা! ছোড়দারা ষড়যন্ত্র করে হি হি—'

'ফুটবল! ফুটবল! তুমি চুপ করবে?'

কিন্তু চুপ করতে ফুটবলের দায় পড়েছে। ফুটবল ছেঁড়া ঘুড়িগুলো নিজেই আরো ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলে, 'নতুদি গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে কাকুদাদুকে আপিসের দরজায় ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসতো, আর কাকুদাদু হি হি; কাকুদাদু চিঠি হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে হি হি—'

ওরা যাকে বলে চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ দাঁড়িয়ে থাকে ফুটবলের এই ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের চেহারার দিকে তাকিয়ে। লজ্জা পাওয়া মুখগুলো নিয়ে যে ঘরের মধ্যে ঢুকে যাওয়া উচিত, তাও যেন ভুলে যায়।

ভেবেছিল দাদুকে দেখিয়ে দেবে তারাও নিখরচায় আমোদ-আহ্লাদ করতে জানে, তাই সমীর তার আফিসের টাইপরাইটার থেকে চিঠিটা টাইপ করে এনেছিল, আর সমীরের বৌ তার চৌকস্ মামাতো বোনকে কাজে লাগিয়েছিল।

কিন্তু ব্যাপারটা যেন আমোদ-আহ্লাদের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্য দিকে চলে গেল।

ফুটবলটা যে এতোবড়ো শত্রুতা করবে তা কে জানতো? পাজীটা এতো নির্বোধ!

ক'দিন ধরে তো ওরা কেবল মজার প্লান নিয়েই বিভোর ছিল। সুশীলবাবু নিজের ছেলেমেয়ের এই দুর্মতিতে মাথা হেঁট করে

আস্তে বড়কাকার সেই পানের কৌটো-ধরা হাতটায় একটি হাত রেখে বলেন, 'বড়কাকা !'

এই ডাকটির মধ্যে ছিল দুঃখ লজ্জা ক্ষমা প্রার্থনা।

কিন্তু এ কী !

বড়কাকা অমন হা হা করে হাসতে শুরু করেন কেন ?

হ্যাঁ, বড়কাকা হা হা করে হাসতে থাকেন অনেকক্ষণ ধরে।

তারপর সুশীলবাবুর কাঁধে একটি রদ্দা মেরে বলেন, 'কী মুস্কিল ! তোর কি সত্যি মন খারাপ হয়ে গেল না কিরে সুশীল ! হা হা হা ! কেন ? তুই কি ভেবেছিলি আমি ওদের ষড়যন্ত্র টের পাইনি ? আবার আমাকে আফিসে ডেকেছে ভেবে আহ্লাদে নাচছি। আরে বাবা, আমি কি পাগল ? না বুদ্ধু ? হা হা হা ! নাতবৌয়ের ওই বোনটিকে তো দেখেই চিনতে পেরেছিলাম কাল। ছেলে সাজলে কি হবে ? মেয়ের গলা কোথায় যাবে ?...তবু ভাঙিনি কাল। চালিয়ে গিয়েছি। ওর মেসোর গল্পতে পর্যন্ত সায় দিয়েছি। তদবধি চালিয়ে যাচ্ছি নাটক।...হা হা। তোরাও এক নাটক ফেঁদেছিস, আমিও তাতে আমার পার্ট প্লে করে যাচ্ছি। দেখলি তো কেমন পাকা এ্যাক্‌টারের মতো শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছিলাম।...বলি, দেখি তোদের দৌড়টা কতদূর ! এই দেখলি তো ?...নিখরচায় আমোদ-আহ্লাদ করা যায় কি না ! কেবলই বলে রেশনের যুগ ! রেশনের যুগ ! আর পয়সা কোথা ? কী ? লোক ঠকিয়ে আমোদ করতে পয়সা লাগে ? হা হা হা।... সেরেছে...গাড়িটা যে ভ্যাঁক্ ভ্যাঁক্ করে মরছে ! চল, চল সবাই মিলে ওই ছেলে সাজা মেয়ে ড্রাইভারের গাড়িটা চড়ে বেড়িয়ে আসা যাক। এসেছে যখন কষ্ট করে।'

এতো বেশী হাসতে থাকেন বড়কাকা যে, হাসির ধমকে চোখ দিয়ে প্রায় জল বেরিয়ে আসে তাঁর।
